জয় জয় ভুবনমঙ্গল মহানাম।
নিতাই গৌর রাধেশ্যাম ॥

শ্রীশ্রীগৌরপদরত্নমালা।

(মর্ম্মানুসারিণী লীলাব্যাখ্যা সম্বলিতা।)

মহানামগুরু শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ এম, এ, বি, এল,
ভাগবততত্ত্ববিশারদ, কাব্যরত্নাকর সঙ্কলিত ও সম্পাদিত।

কলিকাতা মহাউদ্ধারণ মঠ হইতে
শ্রীগোপীবন্ধু দাস কর্ত্তৃক
প্রকাশিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৮।
সন ১৩৪[illegible]

প্রিণ্টার :—
শ্রীললিতমোহন রায়।
ললিত প্রেস
৮১, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সূচীপত্র।

উৎসর্গপত্র

জীবনে সর্ব্বপ্রথম যাঁহার মুখে নিতাইগৌরনাম শুনিয়াছিলাম, শৈশবের প্রতি প্রভাতে যাঁহার ভক্তিগদ্‌গদ কণ্ঠে হরিনাম শুনিয়া নিদ্রা হইতে জাগরিত হইতাম, তুলসী তলায় হরির 'লুট' দিতে যাইয়া যিনি 'গৌর হরিবোল' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইতেন, জীবনের শেষ মুহূর্ত্তেও যিনি সজ্ঞানে তারকব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিতে করিতে মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন, শিশুর মত সরল সাধু ও পরমার্থের উত্তম অধিকারী নিত্যধাম প্রাপ্ত পরম পূজ্যপাদ মদীয় পিতামহ ৺কেরুচরণ ঘোষ অধিকারী মহোদয় এবং যাঁহাদের উৎসাহে, অনুগ্রহে ও আগ্রহে এই 'রত্নমালা' গ্রথিতা হইয়াছেন, আমার সেই অকৈতব বান্ধবগণ ও গৌরলীলারসিক ভক্তগণের কণ্ঠে এই রত্নমালা পরাইয়া দিলাম। ইতি।

শ্রীরামনবমী,
১১ই চৈত্র, ১৩৪০ সাল।
চৈতন্যাব্দ ৪৪৮।
পাটনা।

দীনহীন কৈতবমুগ্ধ,
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ।

ভূমিকা।

শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুসুন্দরায় নমঃ।

ভোগীশবাহোঽপি স্বয়ং ন ভোগী,
যোগীশচ্ছদ্মোঽপি স্বয়ং ন যোগী,
সর্ব্বস্বত্যাগেঽপি ন ভাবত্যাগী,
কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥ ১।
বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

সোণার বাংলার যে পল্লীতে ভূমিষ্ঠ হইয়া শৈশব অতিবাহিত করিয়াছিলাম তথায় হিন্দুমাত্রই গৌরকে প্রাণের ঠাকুর বলিয়া জানে; কেন না, তথায় সকলেই বৈষ্ণবমতাবলম্বী—এক ঘরও শাক্ত গৃহস্থ নাই। তার উপর আমাদের পল্লীগৃহে গ্রামের বৈষ্ণব ভক্তগণের একটী ভাগবত সভা সকাল ও সন্ধ্যায় লাগিয়াই ছিল। সে সভায় যদিও বড় বড় দার্শনিক তত্ত্ব আলোচনা হইত না কিন্তু তথায় গৌরনামের একটী মধুর ঝঙ্কার প্রত্যহই শুনিতে পাইতাম। বোধ করি শৈশবের সেই সুরের জালে পড়িয়া এমন ভাবেই বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি যে, আর নিজেকে সে জাল হইতে মুক্ত করিতে না পারিয়া, সে দেশ সে গ্রাম ছাড়িয়াও গৌরনাম না গাহিয়া, গৌরকথা না কহিয়া থাকিতে পারিতেছি না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর মধুর লীলা ভক্ত ও অধিকারী মহাজনগণ নয়নের জলে বুক ভাসাইয়া লেখনী ও লেখ্যাধার সিঞ্চিত করিয়া যে সকল অমৃতপূর্ণ পদাবলীতে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কীর্ত্তন করিলে যে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যাইতে পারে, অতি বড় পাষণ্ডের চোখেও অশ্রুর ধারা ছোটে, তাহা গৌরলীলারসিক ভক্তমাত্রেই বিশেষরূপে

উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। বিশেষতঃ গৌরলীলায় যদিও পঞ্চরসের তরঙ্গনৃত্য রহিয়াছে তথাপি বিপ্রলম্ভ-রসমূর্ত্তি রসরাজ গৌরাঙ্গের লীলায় করুণ রসেরই প্রবাহ অপর সকল রসকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। গৌরাঙ্গ-সুন্দর প্রেমাশ্রুর যে বন্যা আনিয়াছিলেন, জীবকে প্রেম বিলাইতে যাইয়া নিতাই গৌর দুই ভাই যেমন করিয়া কাঁদিয়াছিলেন, পতিত পাষণ্ড জীবের দ্বারে আসিয়া অনাদৃত ও তিরস্কৃত হইয়াও যে অশ্রুজলছলছল করুণ কোমল নয়নে চাহিয়াছিলেন, তাঁহার জীবোদ্ধার কার্য্য সমাধানের জন্য তিনি গৃহস্থাশ্রমের যা কিছু প্রিয় সব পরিত্যাগ করিয়া কেমন করিয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছিলেন, আপনি কাঁদিয়া গৌর আমার কেমন করিয়া ভক্তগণকে কাঁদাইতেন, নাচিয়া নাচাইতেন, কেমন করিয়া প্রিয়ভক্তের প্রাণের কামনা পূর্ণ করিতেন, শ্রীগৌরাঙ্গের এই সব লীলা শ্রবণে মানুষের প্রাণ কেমন করিয়া গলিয়া যায় এবং অলক্ষিতে নয়নের দু'টি কোণ অশ্রুতে ভরিয়া উঠে, এ দৃশ্য আমরা বহুস্থলে উপলব্ধি করিয়াছি। বিশেষতঃ শ্রীশ্রীকৃষ্ণলীলা কীর্ত্তনে "রসাভাস", "রসভঙ্গ", "অপসিদ্ধান্ত", "অধি-কারী অনধিকারীভেদ", "লীলার কালাকাল" ইত্যাদি অনেক বিষয়ে অপরাধের সম্ভাবনা রহিয়াছে ; কিন্তু কলিযুগ-পাবনাবতার অত্যুদার প্রেমধর্ম্মদানকারী আচণ্ডালে আলিঙ্গনদাতা প্রাণগৌরাঙ্গের লীলায় এ সব অপরাধের লেশমাত্র সম্ভাবনা নাই। কথাটা আর একটু পরিষ্কার করিয়া বলা দরকার। ধরুন, শ্রীকৃষ্ণ লীলার "দান" "মান" "নৌকা-বিলাস" "গোপী-গোষ্ঠ" "পূর্ব্বরাগ" "অভিসার" "রাস" ইত্যাদি পালা আজকাল যে ভাবে পেশাদার কীর্ত্তনীয়ারা যে সব শ্রোতার নিকট কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, তাহাতে উপর্য্যুক্ত অপরাধ হইতে রক্ষা পাওয়া বড়ই দুষ্কর বটে, আমরা বহুস্থলে ইহা লক্ষ্য করিয়াছি যে, পেশাদার কীর্ত্তনীয়ার ষোল আনা লক্ষ্য শ্রোতৃ-বৃন্দের মনোরঞ্জন, সুতরাং কিলকিঞ্চিত রস, বিপ্রলব্ধা, খণ্ডিতা ইত্যাদি নায়িকার

ভাব যে প্রকারে বর্ণন করা হয় তদ্দ্বারা সাধারণ শ্রোতার মনে একটা প্রাকৃত ভাবেরই চিত্র ফুটিয়া ওঠে। তাহাতে পরমার্থে ত কোন কাজই হয় না, বরং সমূহ অনিষ্ট হইয়া থাকে, কেন না আমরা ইহা স্বকর্ণে শুনিয়াছি যে, কৃষ্ণলীলা কীর্ত্তন শ্রবণ করিবার পর শ্রোতৃগণ গায়ককে ইহা বলিয়া আপ্যায়িত করিতেছেন যে, আজ সন্ধ্যা বেলাটি বেশ আমোদে কাটান গেল। লীলাকীর্ত্তন যে শুধু আমোদমাত্র নহে এ জ্ঞান এখনও বহু শ্রোতাকে লাভ করিতে হইবে। নতুবা কীর্ত্তনের প্রচার বৃদ্ধি পাইলেও, সিমলা দিল্লী পর্য্যন্ত কীর্ত্তনের আসর হইলেও, তাহাতে কোন স্থায়ী কল্যাণ হইবে না। কীর্ত্তন—কীর্ত্তন ; উহা যাত্রা, থিয়েটার বা বৈঠকী গান নহে। নাম কীর্ত্তনই হউক আর লীলাকীর্ত্তনই হউক, উহা বৈষ্ণবের ভজন বা Prayer, সুতরাং হৃদয়ে সেই ভজনের ভাব লইয়া কীর্ত্তন গাহিতে হইবে এবং সেই ভাব লইয়া কীর্ত্তন শুনিতে হইবে ; সে লীলাগহনে প্রবেশ করিতে হইলে গৌরাঙ্গকে 'আগুয়া' করিতে হইবে, গৌরাঙ্গের নামে হৃদয় না গলিলে, গৌরলীলার করুণ গাথা শ্রবণে ভাবদুষ্ট আঁখি অশ্রুজলে পুষ্ট না হইলে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া প্রাণগৌর নিত্যানন্দ বলিয়া নাচিতে না পারিলে, ব্রজলীলার সম্ভোগাত্মক পদ শ্রবণ করিতে যাওয়া এক মহা বিড়ম্বনার কাজ হইবে, মহাজনগণ যাহা বলিয়াছেন তাহা কোথায়ও শুধু অর্থবাদ নহে—তত্ত্বপূর্ণ বটে ; ঠাকুর নরোত্তম গাহিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গের মধুরলীলা, যাঁর কর্ণে প্রবেশিলা
হৃদয় নির্ম্মল ভেল তাঁর।"

"গৌরাঙ্গ গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে
সে জন ভকতি-অধিকারী॥

ঠাকুর নরহরি বলিয়াছেন,—

"গাও গাও পুনঃ গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন ॥"

পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য প্রকাশানন্দ সরস্বতী বলিয়াছেন—

"গীয়তাং গীয়তাং ভক্তাশ্চৈতন্য-চরিতামৃতম্।"

প্রভুজগদ্বন্ধু সুন্দর বলিয়াছেন,—

"ঊর্দ্ধবাহু করি, শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরি
জয় জয় রাধে বল।"

উক্তরূপ বহুবিধ মহাজনবাণী হইতে ইহা স্পষ্টই উপলব্ধি করা যায় যে, আপামর সাধারণের প্রাণে ব্রজলীলা রস সিঞ্চনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইলে তাহাতে প্রথমে গৌরলীলারসবৃষ্টি হওয়া দরকার, কেননা গৌরলীলা-কীর্ত্তনে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ বিচার করিতে হইবে না, ব্রজলীলার 'রস-কীর্ত্তনে' তাহা করিতে হইবে, এখানে বহিরঙ্গ থাকিলেও রসাভাসের সম্ভাবনা না থাকায় কীর্ত্তনে অপরাধের ভয় নাই, বিশেষতঃ আমাদের সব চেয়ে বড় দুর্ভাগ্য যে আমাদের কৃষ্ণবিস্মৃতি ও স্বরূপবিস্মৃতি—সেটা এই গৌরলীলা-কীর্ত্তনে প্রাণে প্রাণে ব্যথার তানে বাজিয়া উঠিবে, আর সেই ব্যথাতুর প্রাণ যখন কৃষ্ণক্ষুধাতুর হইয়া উঠিবে তখনই রাধাগোবিন্দলীলা শ্রবণ ও আস্বাদনের যোগ্যতা আমরা পাইব, তৎপূর্ব্বে নহে।

বৈষ্ণব ভক্ত চাহেন, "আমি নয়নজলে চরণ ধোয়াইয়ে দিব"। "কেশে চরণ মুছাইব"—"চারুচরণ পানে চেয়ে রব।" কিন্তু হায়! হায়! সাধ আছে কিন্তু আঁখিতে তো জল নাই, কৃষ্ণবিমুখ হইয়া, প্রেমে বঞ্চিত হইয়া, প্রাণ নীরস হইয়া গিয়াছে অথবা রসের প্রণালীর ভিতর কামনা বাসনার আবর্জ্জনা আসিয়া স্তূপাকার হইয়া হৃদয়ের ভক্তিপ্রবাহের ধারা রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে, কাজেই চোখে জল নাই, সুতরাং প্রেমের ঠাকুরের

পূজার যে শ্রেষ্ঠ উপকরণ সেইটীই যদি না থাকিল তো তাঁহার পূজা হইবে কি করিয়া? ভক্ত গায়ক গাহিয়াছেন,—

"তুলসী আর গঙ্গাজলে, পূজিলে কি তোমায় মিলে,
অশ্রুজলে না ভিজালে চরণ তোমার।"

তাই তো, কি করিয়া এ অশ্রু মিলান যায়? মহাজনগণ বলিয়াছেন, "গৌর ব'লে কাঁদ", গৌরাঙ্গের পাষাণগলান লীলা শ্রবণ কর; এ লীলায় যে অশ্রুর বান ডাকিয়াছে; ইচ্ছায় হউক,—অনিচ্ছায় হউক এই লীলা শ্রবণ করিলে চোখে জল আসিবেই আসিবে। প্রাণ সরল, হৃদয় সিক্ত হইবে, উর্ব্বর হইবে—তারপর জগন্মোহন লীলার বীজ সেখানে রোপণ করিও অতি শীঘ্র ফল পাইবে। গৌরলীলায় যে কি অশ্রুবৃষ্টি হয়, তাহা আপনারা পরখ্ করিয়া দেখুন, আমরা তাহা দেখিয়াছি। কিন্তু দুঃখের বিষয় এক "নিমাইসন্ন্যাস" ব্যতীত বঙ্গদেশে সাধারণ পদকীর্ত্তনীয়াগণ গৌরলীলার আর কোনও অংশ কীর্ত্তন করেন না। ইহার কারণ আর কিছুই নহে, কেবল একটী সংগ্রহগ্রন্থের অভাব; অবশ্য "চৈতন্যমঙ্গল" যাঁহারা গাহিয়া থাকেন তাঁহারা সমগ্র গৌরলীলা পর পর গান করেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প এবং তাঁহারা শুধু লীলাগ্রন্থরচয়িতা মহাকবি লোচনের পদই গাহিয়া থাকেন, অন্য মহাজনের আস্বাদিত পদাবলীর সংগ্রহযুক্ত কোন পদাবলী তাঁহাদের নাই সুতরাং ব্রজলীলাকীর্ত্তনের মত পদবৈচিত্র্য উহাতে নাই। পরমভক্তিভাজন শ্রীশ্রীগৌরপদারবিন্দ-মকরন্দসেবী ভৃঙ্গবর ভক্তরাজ শ্রীল শ্রীযুত রামদাস দাদাজীবন মহোদয় প্রাণগৌরের নাম ও লীলা কীর্ত্তন করিয়া জগৎ মাতাইতেছেন বটে, কিন্তু তিনি একে তো 'কোটীতে গুটী', আবার তার উপর তিনি লীলার যে যে অংশ কীর্ত্তন করেন তাহাতে বড় বড় মহাজনের পদ থাকিলেও একসঙ্গে সংগৃহীত হইয়া সে লীলামৃত-পদাবলী আজ পর্য্যন্তও মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয় নাই, অথচ এমন সময় আসিয়াছে যে, এখন গৌরলীলা শ্রবণের ও

কীর্ত্তনের স্পৃহা দিন দিন বাঙ্গালীদের বাড়িতেছে। এই সকল বিষয় চিন্তা করিয়া নিতান্ত অনধিকারী হইলেও যিনি পঙ্গুদ্বারা গিরি লঙ্ঘন করান তাঁহার কৃপার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া মদীয় সাধনাচার্য্য দেবের আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হইয়া এই গৌরলীলা-পদসংগ্রহরূপ অতি দুরূহ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলাম। সংগ্রহটী কি ভাবে হইয়াছে তৎসম্বন্ধে দু-একটী কথা বলিয়া এই ভূমিকার উপসংহার করিব। ১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে আমি বিষয় কার্য্য উপলক্ষে আসিয়া পাটনায় প্রায় ১ বৎসর কাল অবস্থান করি এবং তখন তথায় একটী ভাগবত সভা প্রতিষ্ঠা করি। সে সভার সভ্য সংখ্যা যদিও খুব কম ছিল বটে, কিন্তু যে কয়জন ছিলেন তাঁহারা সকলেই গৌরাঙ্গের প্রতি সহজপ্রীতিবিশিষ্ট বলিয়া আমরা বড় আনন্দে সায়ংকালটী গৌরগুণ গাহিয়া ও কহিয়া অতিবাহিত করিতাম। যাঁহাদের আলয়ে আমাদের সান্ধ্য-সমিতির বৈঠক হইত, তাঁহারা আমাকে সোদর স্নেহে সিঞ্চিত করিয়া প্রবাসের ক্লেশ ভুলাইয়া রাখিতেন এবং যখনই আমাকে পাইতেন তখনই গৌরের কথা, প্রভু জগদ্বন্ধুর কথা, শ্রীকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধীয় কথা ছাড়া অন্য কোনও প্রসঙ্গই করিতেন না। তাঁহাদের সে স্নেহের ঋণ আমি শোধ করিতে পারিব না। এই "গৌরপদ রত্নমালা" তাঁহাদের দু'টী ভাইয়ের গৌরপ্রীতি ও নিষ্কাম কামনার ফল সুতরাং তাঁহাদের কথা না বলিলে এ ভূমিকা সম্পূর্ণ হইতে পারে না। কিন্তু গভীর পরিতাপ ও অসহ্য মর্ম্মবেদনার বিষয় এই যে সে দু'টী ভাইয়ের একটী ৺যোগেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত দাদাজীবন আমাদের কীর্ত্তনগোষ্ঠীকে চির-কাঙ্গাল করিয়া, ভক্ত-সমাজকে দরিদ্র করিয়া অকস্মাৎ নিত্যধামে প্রয়াণ করিলেন ; আমার বড় দুঃখ রহিয়া গেল এই 'লীলাগ্রন্থ' প্রকাশিত করিয়া তাঁহার মত সদানন্দ কীর্ত্তনপাগল ভক্তের হাতে তুলিয়া দিতে পারিলাম না। কিন্তু যিনি দয়া করিয়া আমাকে এমন সঙ্গ দিয়াছিলেন তিনিই যখন লইয়া গেলেন তখন আর কি করিব? সে যাহাই হউক,

আমি ১৯২১ সালে পুনরায় ঢাকা চলিয়া যাই এবং ১৯২৪ সালের জুন মাসে ৺যোগেন দাদার কনিষ্ঠ সহোদর পরমশ্রদ্ধাপদ শ্রীযুত সুরেন্দ্র চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের একান্ত আগ্রহে পাটনাস্থিত মহাপ্রাণ ভক্ত হাইকোর্টের তদানীন্তন জজ শ্রীল শ্রীযুত প্রফুল্ল রঞ্জন দাশ মহোদয়ের কৃপাহ্বানে ও আদেশে তদীয় ভবনে কীর্ত্তন ও ভাগবত প্রসঙ্গ করিবার জন্য ৭।৮ মাস কাল অবস্থান করি এবং পরমভক্তিভাজন গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা শ্রীযুত দাশ মহোদয়ের ঐকান্তিক আগ্রহে ও আনুকূল্যে আমরা এক অবৈতনিক কীর্ত্তনমণ্ডলী গঠন করি। পূর্ব্বোক্ত গুপ্তভ্রাতৃদ্বয়, প্রাণ গৌরের একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রীযুত বিপিন বিহারী শীল, শ্রীযুত প্রফুল্ল চন্দ্র দে ও ফরিদপুর মহানাম সম্প্রদায়ের সেবক শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু সুন্দরের মর্ম্মীভক্ত কীর্ত্তনকলাভিজ্ঞ শ্রীযুক্ত গোপীবন্ধু দাশ দাদাজীবনকে লইয়া দাশ মহোদয়ের ভবনে প্রায় প্রত্যহ কীর্ত্তন করিতে থাকি। আমাদের সে কীর্ত্তন যজ্ঞে সমিধ্ সংগ্রহের ভার নিয়াছিলেন মদীয় আচার্য্যদেব শ্রীশ্রীপাদ মহেন্দ্রজী। তাঁহারই ইচ্ছায় ও প্রেরণায় আমার মত বিষয়কীট শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধু-সুন্দরের শিশিরোৎসবে ফরিদপুর শ্রীঅঙ্গনে সাক্ষাৎ প্রভুর সম্মুখে ১৩২৬ সনের মাঘ মাসে সর্ব্বপ্রথম পদকীর্ত্তন করিয়াছিল; তাঁহারই ইচ্ছায় নিতান্ত অজ্ঞ ও পাষণ্ড হইলেও এই জীবাধম পাটনায় আসিয়া পদকীর্ত্তন আরম্ভ করিল। প্রথম দিন "নিমাই সন্ন্যাস" পালায় একটা অশ্রুর বৃষ্টি দেখিয়া দাশ মহোদয় আদেশ করিলেন—"সমস্ত গৌরলীলা পালাকারে বিভক্ত করিয়া কীর্ত্তন করা হউক"। আমিও সেই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভগবত, শ্রীচৈতন্যমঙ্গল, বৈষ্ণবপদাবলী, মহাজনপদাবলী, গৌরপদ-তরঙ্গিনী, সঙ্গীতসার-সংগ্রহ, বাসুঘোষের পদাবলী, লোচনের ধামালী ইত্যাদি গ্রন্থ হইতে পদরত্ন উদ্ধার করিতে ব্রতী হইলাম। কিছু প্রাচীন পদ যাহা সংগ্রহ গ্রন্থে পাওয়া যায় নাই তাহা আমার স্বগ্রামবাসী সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া ও পরম গৌরভক্ত শ্রীযুত

রাধারমণ সাহা খুড়া মহাশয়ের নিকট হইতে শুনিয়া সংগ্রহ করিয়াছি ; গৌরলীলা ও গৌরগুণ গাহিবার প্রবৃত্তি আমি তাঁহার নিকটই সর্ব্বপ্রথম লাভ করি এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। ইহা ছাড়াও লীলাটীকে পালাকারে গ্রথিত করিবার চেষ্টায় কোন কোন স্থানে উপযোগী পদের অভাব বোধ করিয়াছি ; তত্তৎস্থলে বামনের চাঁদ ধরার প্রয়াসের মত পদরচনার প্রয়াস করিয়াছি। গৌরপদ রত্নমালায়—'গোবিন্দ দাস' ভণিতাযুক্ত পদ সকল সেই শ্রেণীর পদ। আশা করি, সাধু গুরু বৈষ্ণবগণ আমার এই ধৃষ্টতা ক্ষমা করিবেন। আমার উক্ত বান্ধবগণ আমাকে এতই কৃপা করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় বিষয় কর্ম্মের ক্ষতি স্বীকার করিয়াও গৌরলীলা গাহিবার জন্য আমার সঙ্গে পশ্চিম ভারত, মধ্যভারত, পঞ্জাব ও বিহারের বহুস্থানে কীর্ত্তন অভিযানে যাত্রা করিয়া আমাকে কৃতার্থ করিয়াছেন। তাঁহাদের সে ঋণ আমি এ জীবনে পরিশোধ করিতে পারিব না। আর একটী ভক্ত যাঁহার অশ্রু-টলটল বিমল বদনটী দেখিয়া আমি কীর্ত্তনে শক্তি পাই এবং যাঁহার স্নেহ ও উৎসাহ আমাকে গৌরকথা গাহিতে ও কহিতে চিরদিন নাচাইয়াছে—পরমদয়াল গৌরবিভুর অতি প্রিয় ও অন্তরঙ্গ ভক্ত ও সদাভজনশীল পরম ভক্তিভাজন পিতৃপ্রতিম শ্রীল শ্রীযুত অমর নাথ চট্টোপাধ্যায় পাটনা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মহাশয়ের সদিচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ এই গ্রন্থ প্রণয়নে কতখানি সাহায্য করিয়াছে তাহা ভাষায় বুঝান কঠিন —কিন্তু তাহার প্রভাব যে অনেক বেশী তাহা আমি বেশ বুঝিয়াছি, শ্রীযুত দাশ মহোদয়ের গৌরাঙ্গ-প্রীতি ও কীর্ত্তনানুরাগ যে কি জিনিষ তাহা যে না দেখিয়াছে সে বুঝিতেই পারিবে না। তিনি পাটনাতে 'গরাণহাটী' কীর্ত্তন শিখাইবার জন্য সার্ব্বভৌম কীর্ত্তনীয়া—নিত্যধাম প্রাপ্ত স্বর্গীয় অদ্বৈত দাস পণ্ডিত বাবাজীকে ও বহু অর্থব্যয়ে পাটনাতে আনিয়া রাখিয়াছিলেন—কিন্তু বাবাজী মহাশয়ের বার্দ্ধক্যজনিত নানা

অসুস্থতানিবন্ধন তিনি স্বধামে চলিয়া যাওয়াতে তাঁহার সংকল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তৎপরে মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারণ করতঃ শ্রীযুত দাশ মহোদয় সুদক্ষ কীর্ত্তনীয়া শ্রীযুত হরিদাস বাবাজী মহাশয়কে পাটনা আনিয়া দীর্ঘকাল রাখিয়াছিলেন—এই গ্রন্থে যে সব সুর ও তাল পদের সঙ্গে যোজনা করা হইয়াছে, তাহার অনেকটা উক্ত বাবাজী মহাশয়ের যোজিত; তাঁহার এই কৃপার জন্য আমি তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ।

পরিশেষে আর একটী কথা বলা প্রয়োজন এই যে, এই গ্রন্থ লোক মনোরঞ্জক ভাবে গৌরলীলা প্রচার করিবার উদ্দেশ্যে প্রকাশিত হইতেছেন। গ্রন্থ প্রকাশের সম্পূর্ণ ব্যয় এমন এক মহানুভব বহন করিয়াছেন —যিনি প্রাণ গৌরের অতি অন্তরঙ্গ ও পরম প্রিয় ভক্ত এবং যাঁহাকে সমর্থ জানিয়া মহাপ্রভু তাঁহার শিরে প্রেমধর্ম্ম প্রচারের গুরু ভার অর্পণ করিয়াছেন। ভক্তগণ এই মালা সাদরে গ্রহণ করিলে তিনি আরও মাল্য রচনা করাইবেন। তাঁহার নিষেধ তাই তাঁহার নাম প্রকাশ করিতে পারিলাম না—কিন্তু আমাকে যাঁহারা জানেন আশা করি তিনি ধরা না দিলেও তাঁহারা তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিবেন। ইতি—

রামনবমী,
১১ই চৈত্র ১৩৪০
চৈতন্যাব্দ ৪৪৮
১৩৪০

ভক্ত-পদরেণু-প্রার্থী ও
বৈষ্ণব-কৃপাকাঙ্গাল
শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ঘোষ।
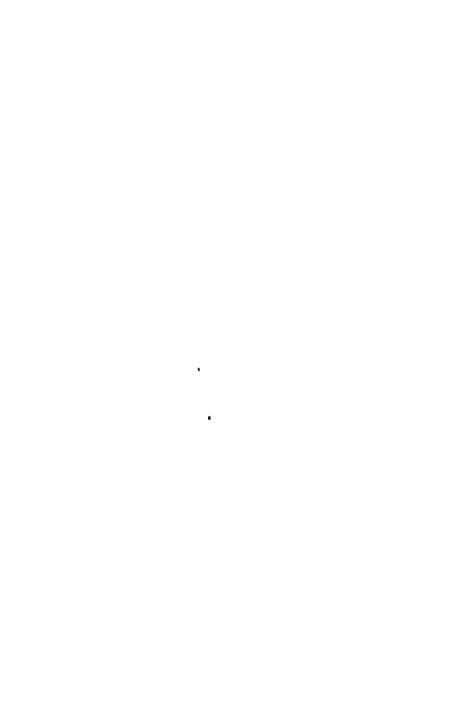
শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ জন্মলীলা ও গৌর অবতারের অন্তরঙ্গ প্রয়োজন।

নান্দী বা পূর্ব্বাভাষ।

(১)

ললিত—মধ্যম দশকুশী।

নিধুবনে দুহুঁ জনে, চৌদিকে সখীগণে,
শুতিয়াছে রসের আলসে।
নিশিশেষে বিধুমুখী, উঠিলেন স্বপ্ন দেখি,
কাঁদি কাঁদি কহে বঁধুপাশে॥
উঠ উঠ প্রাণনাথ, কি দেখিলাম অকস্মাৎ,
এক যুবা গউর বরণ।
কিবা তার রূপঠাম, জিনি কত কোটী কাম,
রসরাজ রসের সদন॥
অশ্রু কম্প পুলকাদি, ভাবভূষা নিরবধি,
নাচে গায় মহামত্ত হৈঞা।
অনুপম রূপ দেখি, জুড়াইল মোর আঁখি,
মন ধায় তাঁহারে দেখিয়া॥

শ্রীভগবানের লীলা নিত্য, তাঁহার রূপ ও নিত্য। মায়িক প্রপঞ্চে প্রভু তাঁহার নিজের স্বরূপ যে রূপ ও বিগ্রহের আশ্রয়ে প্রকাশ করিয়া

নবজলধর রূপ, রসময় রসকূপ
ইহা বৈ না দেখি নয়নে।
তবে কেন বিপরীত, হেন ভেল আচম্বিত,
কহ নাথ ইহার কারণে ॥

থাকেন, তাহাও নিত্য। তাহা যে কেবল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, তাহা নহে. প্রকট লীলায় সে শ্রীবিগ্রহ প্রকাশ হইবার পূর্ব্বেও তাহা ছিলেন ও প্রকট লীলা অবসান হইবার পরেও উহা থাকেন। এই কথাই শ্রীশ্রীমহাপ্রভু জীবকে শুনাইয়া গিয়াছেন, এবং শ্রীল শ্রীযুত সনাতন গোস্বামী পাদকে শিক্ষা দেওয়ার সময় প্রভু বলিয়াছিলেন,—

'যোগমায়া চিচ্ছক্তি, শুদ্ধ সত্ত্ব পরিণতি, তার শক্তি লোকে দেখাইতে।
এই রূপরতন, ভক্তগণের গূঢ়ধন, প্রকট কৈলা নিত্যলীলা হৈতে ॥"

শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে আশ্রয় করিয়া আপনার লীলাবিগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। তাই কলিতে যে মধুরতর লীলার অনুষ্ঠান হইবে, দ্বাপরেই ভগবান্ তাহার পূর্ব্বাভাষ স্বপ্নে শ্রীমতীকে দেখাইতেছিলেন। এই লীলার নাম "স্বপ্নবিলাস"। গৌরলীলার অন্তরঙ্গ প্রয়োজন এই স্বপ্নবিলাসে সুন্দররূপে বিবৃত করা হইতেছে।

চতুর্থ পদে রসরাজ শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব," ইহাতে "নদীয়া নগরপরে করবহুঁ কেলি," ইত্যাকার পূর্ব্বোক্ত পদের সহিত বিরোধ ঘটিতেছে. ইহার সমাধান এই যে নদীয়া নগরে প্রভু স্বয়ং স্বীয় ধাম ও পরিকরসহ অবতীর্ণ হইবেন ইহাই অঙ্গীকার করিতেছেন। যেমন লীলাবৃন্দাবন নিত্যবৃন্দাবন গোলোকধামের সঙ্গে অভিন্ন, তদ্রূপ শ্রীশ্রীগৌড়মণ্ডল ও শ্রীশ্রীব্রজমণ্ডল হইতে অভিন্ন; সুতরাং যদিও শ্রীশ্রীভগবানের বাক্য আছে যে "বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য পাদমেকং ন গচ্ছামি" তাহা সত্ত্বেও তাঁহার নদীয়া নগরে অবতীর্ণ হওয়ার কোন বাক্য হানি হয় না, কেন না বৃন্দাবনধাম ও ব্রজের পরিকর সঙ্গে লইয়াই শ্রীশ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র শ্রীশ্রীনদীয়া পুরন্দর রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

চতুর্ভুজ আদি কত, বনের দেবতা যত,
দেখিয়াছি এই বৃন্দাবনে।
তাহে তিরপিত মন, না হইল কদাচন,
(এই) গৌরাঙ্গ হরিল মোর মনে॥
এতেক কহিতে ধনী, মূর্চ্ছাপ্রায় ভেল জানি,
বিদগধ রসিক নাগর।
কোলেতে করিয়া বেড়ি, মুখ চুম্বে কত বেরি,
হেরিয়া জগদানন্দ ভোর॥

(২)

গৌরী—তেওট্॥

শুনইতে রাই বচন অধরামৃত বিদগধ রসময় কান।
আপনাক ভাবে, ভাব প্রকাশিতে,
অনুমতি ভেল জান।
সুন্দরি! যে কহিলে গৌর স্বরূপ।
কোই নাহি জানয়ে, কেবল তুয়া প্রেম বিনা,
মোহে করবি হেনরূপ॥
কৈছন তুয়া প্রেমা, কৈছন মধুরিমা,
কৈছন সুখে তুহুঁ ভোর।
এ তিন বাঞ্ছিত ধন, ব্রজে নহিল পূরণ,
কি কহব না পাইয়া ওর॥

ভাবিয়া দেখিনু মনে, তোহারি স্বরূপ বিনে.
এ সুখ আস্বাদ কভু নয়।
তুয়া ভাব কান্তি ধরি, তুয়া প্রেমগুরু করি,
নদীয়াতে করব উদয় ॥
সাধব মনের সাধা, ঘুচাব মনের বাধা,
জগতে বিলাব প্রেমধন।
বলরাম দাসে কয় প্রভু মোর দয়াময়,
না ভজিনু মুঞি নরাধম ॥

(৩)

সুহই—ছোট দশকুশী।

বঁধু হে শুনইতে কাঁপই দেহা।
তুহুঁ ব্রজজীবন, তুয়া বিনু কৈছন,
ব্রজপুর বাঁধব থেহা ॥
জল বিনু মীন, ফণী মণি বিনু,
তেজয়ে আপন পরাণ।
তিল আধ তুহারি, দরশ বিনু তৈছন,
ব্রজপুরগতি ভুর্ত্ত জান ॥
সকল সমাধি, কোন সিধি সাধবি,
পাওবি কোন হি সুখ।

কিয়ে আনজন তুয়া মরমহি জানব,
ইথে লাগি বিদরয়ে বুক ॥
বৃন্দাবনকুঞ্জ নিকুঞ্জহি নিবসয়ি,
তুহুঁ বর নাগর কান।
অহর্নিশি তুহারি, দরশ বিনু ঝুরব,
তেজব সবহুঁ পরাণ ॥
অগ্রজ সঙ্গে রঙ্গে যমুনাতটে
সখা সঞে করবি বিলাস।
পরিহরি মুঝে কিয়ে, প্রেম প্রকাশবি,
না বুঝয়ে বলরাম দাস ॥

(৮)

ধানশী—জব তাল।

শুনহ সুন্দরি মঝু অভিলাষ।
ব্রজপুর প্রেম করব পরকাশ ॥
গোপ গোপাল সব জন মেলি।
নদীয়া নগরপরে করবহুঁ কেলি ॥
তনু তনু মেলি হোই একঠাম।
অবিরত বদনে বোলব তব নাম ॥

ব্রজপুর পরিহরি কবহুঁ না যাব ;
ব্রজবিনু প্রেম না হোয়ব লাভ ॥
ব্রজপুর ভাবে পূরব মনকাম।
অনুভবি জানল দাস বলরাম ॥

(৫)

বরাড়ী—একতালী।

এত শুনি বিধুমুখী, মনে অতি হয়ে সুখী,
কহে শুন প্রাণনাথ তুমি।
কহিলে সকল তত্ত্ব, বুঝিনু স্বপন সত্য,
সেইরূপ দেখিব হে আমি ॥
আমারে যে সঙ্গে লবে, দুই দেহ এক হবে,
অসম্ভব হইবে কেমনে।
চূড়া ধরা কোথা থোবে, বাঁশী কোথা লুকাইবে,
কাল গৌর হইবে কেমনে।
এত শুনি কৃষ্ণচন্দ্র, কৌস্তুভের প্রতিবিম্বে,
দেখাওল শ্রীরাধার অঙ্গ।
আপনি তাহে প্রবেশিলা, দুই দেহ এক হৈলা,
ভাব প্রেমময় সব অঙ্গ ॥
নিধুবনে এই ক'য়ে, দুহুঁ তনু এক হ'য়ে,
নদীয়াতে হইল উদয়।

সঙ্গেতে সে ভক্তগণে, হরিনাম সংকীর্ত্তনে
প্রেমবন্যায় জগত ভাসায় ॥
বাহিরে জীব উদ্ধারণ, অন্তরে রস আস্বাদন,
ব্রজবাসী সখাসখী সঙ্গে।
বৈষ্ণব দাসের মন, হেরি রাঙ্গা শ্রীচরণ,
না ভাসিলাম সে সুখ তরঙ্গে ॥

জন্মলীলা

(৬)

সুহই—জোৎসোম তাল।

ফাল্গুণ পূর্ণিমা তিথি শুভগ সকলি।
জনম লভিবে গোরা পড়ে হুলাহুলি॥
অম্বরে অমর সবে ভেল উনমুখ।
লভিবে জনম গোরা যাবে সব দুখ॥
শঙ্খ দুন্দুভি বাজে পরম হরিষে।
জয়ধ্বনি সুরকুল কুসুম বরিষে॥
জগভরি হরিধ্বনি উঠে ঘন ঘন।
আকুল বনিতা আদি নর নারীগণ॥
শুভক্ষণ জানি গোরা জনম লভিলা।
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন প্রকাশ করিলা॥
সেই কালে চন্দ্রে রাহু করিল গ্রহণ।
হরি হরি ধ্বনি উঠে ভরিয়া ভুবন॥
দীনহীন উদ্ধার হইবে ভেল আশ।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে জগন্নাথদাস॥

(৭)

মায়ূর—তেওট।

নদীয়া আকাশে আসি, উদিল গৌরাঙ্গ শশী.
ভাসিল সকলে কুতূহলে।
লাজেতে গগন শশী, মাখিল বদনে মসী,
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে॥
বামাগণ উচ্চস্বরে, জয় জয় ধ্বনি করে,
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শাঁক।
দামামা দগড় কাঁসি, সানাই ভেঁউড় বাঁশী,
তুড়ী ভেরী আর জয় ঢাক॥
মিশ্র জগন্নাথ মন, মহানন্দে নিমগন,
শচীর সুখের সীমা নাই।
দেখিয়া নিমাইর মুখ, ভুলিলা প্রসব দুখ,
অনিমিখে পুত্রমুখ চাই॥
গ্রহণের অন্ধকারে, কেহনা চিহ্নয়ে কারে
দেব নরে হৈল মিশা মিশি।
নদীয়া নাগরী সঙ্গে, দেবনারী আসি রঙ্গে,
হেরিছে গৌরাঙ্গ রূপরাশি॥
পুত্রের বদন দেখি, জগন্নাথ মহা সুখী,
করে দান দরিদ্র সকলে।
ভুবন আনন্দময়, গৌরবিধু সমুদয়,
বাসু কহে জীব ভাগ্য ফলে॥

(৮)

বসন্ত—ধরা।

ফাল্গুন পূর্ণিমা নিশি   শচী অঙ্কাকাশে আসি,
গৌরচন্দ্র হইল উদয়।
সে শশীর সহচর,   ভক্ত তারকা নিকর,
চারিদিকে প্রকাশিত হয়॥
পাপ ঘোর অন্ধকার,   সর্ব্বত্র ছিল বিস্তার,
বিধূদয়ে প্রস্থান করিল।
জীবের ভাগ্য কুমুদ,   হেরি শশী মনোমদ,
প্রেমানন্দে হাসিতে লাগিল॥
পাপ অমানিশি ভোর,   হরিষে ভক্তচকোর,
তুলিল আনন্দ কোলাহল।
প্রেম কৌমুদীর সুধা,   পীয়ে দূর কৈল ক্ষুধা,
সবাই হইল সুশীতল॥
সে প্রেম সুধার কণা,   পাঞা তৃপ্ত সর্ব্বজনা,
জীবকুল ভেল আনন্দিত।
আপন করম দোষে   না পাইয়া লব লেশে,
প্রেম দাস ধূলায় লুণ্ঠিত॥

(৯)

বিভাষ—দাঁসপাড়িয়া

ফাল্গুন পূর্ণিমা শুভক্ষণে।
পুত্র প্রসবিয়া শচী চাহে পুত্রপানে॥

তিলে তিলে কত উঠে চিতে।
কনকমবনা ভ্রমে নারে পরশিতে ॥
কত না যতনে কোলে করে।
পুত্রের জনম জানাইয়া মিশ্রবরে ॥
জগন্নাথ বিপ্রশিরোমণি।
ভাসে সুখ সমুদ্রে পুত্রের জন্ম শুনি ॥
কত সাধে চলয়ে ধাইয়া।
না ধরে ধৈরজ চাঁদমুখ নিরখিয়া ॥
লইয়া আপন প্রিয়গণে।
করয়ে মঙ্গল কর্ম্ম পুত্রের কল্যাণে ॥
চতুর্দ্দিকে জয় জয় ধ্বনি।
সবে কহে ধন্য ধন্য জনক জননী ॥
সবার অন্তরে বাড়ে সুখ।
সুরধুনী ধরণী বিসরে সব দুখ ॥ *

সুরধুনী গঙ্গা বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা হইয়া যে ধরণীতে পতিত হইয়াছেন, বহুদিন সেই শ্রীপাদপদ্ম ধোয়াইয়া দেওয়ার সৌভাগ্য তাঁহার ঘটে নাই। দ্বাপর যুগে গঙ্গার অনুগতা যমুনাকে প্রভু লীলরসদানে কৃতার্থা করিয়াছিলেন, কিন্তু গঙ্গার ভাগ্যে সে মধুর মনোরম উজ্জলরসের লীলা প্রত্যক্ষ করা হইয়া উঠে নাই, গঙ্গা সে যুগে একেবারেই বঞ্চিতা হইলেন বলিয়া তাহার প্রাণে এক মহা খেদ রহিয়া ছিল; শ্রীগৌরাঙ্গের উদয়ে গঙ্গার এবার সকল খেদ মিটিয়া গেল, কেননা এবার প্রভু 'সুরধুনী তটবিহারী' হইয়া যমুনার ভাগ্য সুরধুনীকে দান করিলেন এবং গঙ্গাকে স্বীয় যুগল

দশ দিক হইল উজ্জ্বল।
পশুপক্ষী বৃক্ষলতা প্রফুল্ল সকল॥
নরহরি কি কহিবে আর।
গৌরচন্দ্রোদয়ে গেল পাপ অন্ধকার॥

চরণ ও অপ্রাকৃত বিগ্রহ নিত্য অভিষেক করিবার সৌভাগ্যদানে কৃতার্থ করিলেন। ধরণীর দুঃখ এই যে জীবকুল নিত্যস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সকলেই পাপাচরণে রত, কৃষ্ণভক্তিগন্ধশূন্য সংসারে কেউ হরি বলিতেছে না; হরিবোল্ বলিয়া আনন্দে ধরার বক্ষ আন্দোলিত করিয়া কেহই নাচিতেছে না, পাষণ্ডের অত্যাচারে ধরা পাপভারাক্রান্তা হইয়াছেন, এমন সময় শ্রীভগবান্ স্বয়ং গৌরচন্দ্র রূপে উদিত হওয়ায় ধরার সকল দুঃখ দূর হইল কেননা এইবার ধরার পাপ ভার প্রভু হরণ করিবেন, ধরাপীড়নকারী অসুর স্বভাব পাষণ্ডকুলকে দমন করিবেন; ধরার বুকে রাঙ্গা পা ফেলিয়া হরি বলিয়া নাচিয়া বেড়াইবেন, প্রভুর সঙ্গে ধরণীদেবী নিত্য ধামের সঙ্গী পরিকর দিগের ও দর্শন ও স্পর্শলাভে কৃতার্থা হইবেন। তাই আজ ধরণীরও উল্লাস।

পাষণ্ড দলন

বা

জগাই মাধাই উদ্ধার ।

পাষণ্ডদলন।

(১)

পূরবী—ঝাঁপতাল।

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নাম।
কলিমদ মথন নিত্যানন্দ রাম॥
অপরূপ হেম কলপতরু জোর।
প্রেম রতন ফল ধরল উজোর॥
অযাচিত বিতরই কাহে না উপেখি।
ঐছন সদয় হৃদয় নাহি দেখি॥
যে নাচিতে নাচয়ে বধির জড় অন্ধ।
কাঁদিতে অখিল ভুবন জন কাঁদ॥
তেঁই অনুমানিয়ে তুঁহু পরমেশ।
প্রতি দরপণে জনু রবির আবেশ॥

শ্রীধাম নবদ্বীপে আজ এক অপরূপ লীলার অনুষ্ঠান করিবেন বলিয়া সর্ব্বান্তর্যামী বিভুচৈতন্য শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর জীবের একমাত্র গতিস্বরূপ সংকর্ষণরূপী শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ চন্দ্রকে জীবের দ্বারে হরিনাম বিলাইতে পাঠাইয়া দিলেন। প্রভু নিত্যানন্দ বৈষ্ণব শিরোমণি হরিদাসকে সঙ্গে লইয়া নাম বিলাইতে চলিলেন।

ইহ রসে যাহার নাহিক বিশোয়াস।
মলিন মুকুরে নাহি বিম্ব বিকাশ॥
গোবিন্দ দাসিয়া কহে তাহে কি বিচার।
কোটী কলপে তার নাহিক নিস্তার॥

(২)

বরাড়ী—একতালী।

প্রভু কহে নিত্যানন্দ, সব জীব হ'ল অন্ধ,
কেহ ত না পেল হরিনাম।
এই নিবেদন তোরে, নয়নে হেরিবি যারে,
কৃপা করি লইয়াইও নাম॥
কৃত পাপী দুরাচার, নিন্দুক পাষণ্ডী আর,
কেহ যেন বঞ্চিত না হয়।
শমন বলিয়া ভয়, জীবে যেন নাহি রয়,
সুখে যেন হরিনাম লয়॥
কুমতি তার্কিক জন পড়ুয়া অধম গণ,
জন্মে জন্মে ভকতি বিমুখ।
কৃষ্ণ প্রেম দান করি, বালক পুরুষ নারী,
খণ্ডাইহ সবাকার দুখ॥
সংকীর্ত্তন প্রেম রসে, ভাসাইয়া গৌড় দেশে,
পূর্ণ কর সবাকার আশে।
হেন কৃপা অবতারে, উদ্ধার নহিল যারে,
কি করিবে বলরাম দাসে॥

(৩)

ললিত রাগ—ছোট দশকুশী।

গজেন্দ্র গমনে ধায়, সকরুণ দীঠে চায়
পদ ভরে মহী টলমল।
মত্ত সিংহ গতি জিনি, কম্পমান মেদিনী,
পাষণ্ডীগণ শুনিয়া বিকল॥
আওত অবধূত করুণার সিন্ধু। ধ্রু
প্রেমে গড় গড় মন, করে হরি সংকীর্ত্তন,
পতিত পাবন দীনবন্ধু॥
যার লীলা লাবণ্য ধাম, আগমে নিগমে গান,
যার রূপ মদন মোহন॥

পদকর্ত্তার উক্তির ব্যাখ্যা হইবে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমহাজনগণ একবাক্যে এই বিধি দিয়াছেন যে যদি ব্রজের নিগূঢ়লীলারস আস্বাদন করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে নিতাইর কৃপা ভিন্ন গত্যন্তর নাই। হে সাধক! তুমি তোমার নিজের সাধন ভজনের যতই স্পর্দ্ধা কর না কেন, তোমার আত্মশক্তির যতই বড়াই কর না কেন, সংকর্ষণের কৃপা ব্যতীত লীলাধামে প্রবেশ কর্ব্বার অধিকারই তোমার নাই, কেননা সংকর্ষণই লীলার প্রকাশক ও বিস্তারক। শ্রীশ্রীকৃষ্ণের অনন্তশক্তির মধ্যে তিনশক্তি প্রধান—"ইচ্ছাশক্তি, জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি।" ইচ্ছাশক্তিপ্রধান শ্রীকৃষ্ণ, জ্ঞানশক্তিপ্রধান বাসুদেব ও ক্রিয়াশক্তিপ্রধান সঙ্কর্ষণ। সুতরাং প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সকল সৃষ্টির মূলেই প্রথমতঃ সঙ্কর্ষণ তৎপর বাসুদেব ও সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ। অতএব বদ্ধজীবের সহিত ভগবানের সম্বন্ধ বিচার

এবে অকিঞ্চন বেশে, ফিরে পঁহু দেশে দেশে,
উদ্ধার করয়ে ত্রিভুবন ॥
ব্রজের বৈদগ্ধি সার, যত যত লীলা আর,
পাইবারে যদি থাকে মন।
বলরাম দাসে কয়, মনোরথ সিদ্ধি হয়,
ভজ ভজ শ্রীপাদ চরণ ॥

(৪)

ধানশ্রী রাগ—বড়দাস পাঁড়িয়া।

অক্রোধ পরমানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
অভিমান শূন্য নিতাই নগরে বেড়ায় ॥
অধম পতিত জীবের ঘরে ঘরে গিয়া।
হরিনাম মহামন্ত্র দিচ্ছেন বিলাইয়া ॥

করিতে গেলে সর্ব্বাপেক্ষা ঘনিষ্ট সম্বন্ধ সঙ্কর্ষণের সঙ্গেই দেখা যায়—এবং ক্রিয়াশক্তির মূলাধার বলিয়া তিনিই মায়ার দ্বারা জীবের সঙ্গে ভগবানের বিচ্ছেদ ঘটাইয়া কল্পান্তকালে সম্যক্‌রূপে আকর্ষণ করিয়া আবার মিলাইয়া দিয়া থাকেন, এই জন্যই তাঁহাকে সঙ্কর্ষণ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। যথা, মৎস্যপুরাণে—

"সঙ্কর্ষয়সি ভূতানি কল্পে কল্পে পুনঃ পুনঃ।
ততঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রোক্ত স্তত্ত্বজ্ঞান বিশারদৈঃ ॥"

কিন্তু কল্পান্তকাল ব্যতীত ও ভগবান্ সঙ্কর্ষণ আপনার আনন্দময় স্বরূপের সেবায় নিযুক্ত করিতে অনাদি বহির্ম্মুখ জীবকে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। যিনি অনন্তানন্তময়, যিনি দেশ কাল ও পাত্রের অতীত, যাঁহাকে শ্রুতি "স ভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বাত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।" বলিয়া বর্ণনা

যারে দেখে তারে বলে দন্তে তৃণ ধরি।
আমারে কিনিয়া লহ কহ গৌর হরি॥
এতবলি নিত্যানন্দ ভূমে গড়ি যায়।
সোণার পর্ব্বত যেন ধূলাতে লোটায়॥
হেন অবতারে যার রতি না জন্মিল।
লোচন বলে সেই পাপী এল আর গেল॥

করিয়াছেন, তাঁহার সেবা করে এমন কার সাধ্য আছে? তিনি আত্মারাম, নিজেই নিজের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকেন, সেই খেলায় ও সেই সেবায় যোগ দিতে পারাই জীবের চরমপুরুষার্থ, অনন্তানন্তময় শ্রীশ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের অনন্তপ্রকার সেবা বিধান করিবার জন্য স্বয়ং প্রভুই দাস হইয়া অনন্ত উপকরণে নিঃশেষে সেবার কার্য্য বিধান করিয়া 'শেষ' আখ্যা ধারণ করিয়াছেন। তথাহি শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে—

"সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।
গৃহ, ছত্র, বস্ত্র, যত ভূষণ আসন॥
আপনে সকলরূপে সেবেন আপনে।
যারে অনুগ্রহ করে পায় সেইজনে।"

যদুক্তং শ্রীযামুনাচার্য্যপাদৈঃ—(তত্রৈব)

"নিবাস-শয্যাসন-পাদুকাংশুকোপাধান-বর্ষাতপ-বারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈর্যথোচিতং শেষ ইতীরিতো জনৈঃ॥"

ভাটিয়ারী রাগ—জপ তাল।

(আজ) বসেছে ভবের ঘাটে নূতন খেয়া।
(কত ধনী মানী পার হইবার নূতন খেয়া)
(কত দুঃখী কাঙ্গাল পার হইবার নূতন খেয়া)
আমার গৌরাঙ্গের সোনার তরী রে,—
দয়াল নিতাই মাঝি তায়।
কত রসিক দাঁড়ী গায় সারি, বায় সোনার দাঁড়,
(শ্রীবাস অদ্বৈত গদাধর আদি রসিকদাঁড়ী)
নৌকা চলে সমান রে এ—এ—এ
নৌকা চলে সমান, ভাঁটি উজান, ঝড় তুফান নাহি মানে॥
তোরা কে যাবি আয় সময় তো যায় রে,
দয়াল নিতাই ঘন ডাকে।

সংকর্ষণ তত্ত্ব তো এই, এবং এই সংকর্ষণের দ্বারাই শ্রীশ্রীভগবানের লীলা প্রকটিত হইয়াছে, লীলা প্রকট করিতে হইলে সেবার উপকরণ আবশ্যক অথচ ভগবান স্বরূপে অনন্ত, বাক্য মনের অগোচর, কে তাঁহার সেবার উপকরণ যোগাইবে? কাহারও সে সাধ্য নাই বলিয়া তিনি নিজেই নিজের সেবা করিতে সংকর্ষণ রূপ ধারণ করিলেন ও নিত্য কৃষ্ণদাস জীবকে শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত করিবার জন্য আকর্ষণ করিতে লাগিলেন, এই মূল সংকর্ষণই শ্রীশ্রীনিত্যানন্দরূপে অবতীর্ণ ও এই আকর্ষণ তাঁহার করুণার আহ্বান, যে ভাগ্যবান্ নিতাইচাঁদের করুণায় ডুবিতে পারিল তাহার জীবন ধন্য হইয়া গেল, তিনি স্বীয় স্বরূপের সন্ধান পাইয়া কৃষ্ণসেবায় মাতিয়া ভগবানের নিত্যদাস হইলেন, তাহা যে না পাইল তাহার পোড়া কপাল! তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাজনগণ বলিয়াছেন

ও তার ডাক শুনিয়া লোক আসিয়া জুট্‌ল লাখে লাখে ॥
সেথায় চাকর মনিব রে,
সেথায় চাকর মনিব এক ঠাঁই, ভাই ধনের গৌরব নাই।
(সেথায় মানের গৌরব নাই)
(সেথায় বিদ্যার গৌরব নাই)
(ইচ্ছামত আঁখর চলিবে)

ভাটিয়ারী রাগ—দাস পাড়িয়া।

নদীয়ায় প্রেমের নূতন হাট ব'সেছে।
ব্রজের রপ্তানী,—ন'দেয় আম্‌দানী,
মাল আনিয়া এক দোকানী হাজার দোকান খুলেছে ॥
চায়না কেহ দর, লয়না কেহ কর,
না চেনা যায় আপনা পর এতই ভিড় হ'য়েছে ॥

নিতাইচরণ ভিন্ন কলির জীবের আর গতি নাই ! গতি নাই ! গতি নাই !!
ঠাকুর নরোত্তমও গাহিয়াছেন —

নিতাই পদ সুবিমল, কোটিচন্দ্র সুশীতল
যে ছায়ায় জগত জুড়ায়।
হেন নিতাই বিনে ভাই, রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই
দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায়।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিতাই পদ পাশরিয়া
অসত্যেরে সত্য করি মানি।

হাটেতে যে যায়, যা চায় তাই পায়,
যত বিকায় নাহি ফুরায় এতই মাল উঠেছে ॥
শ্রীগৌরাঙ্গের গদী, দয়াল নিতাই মুদী,
খরিদ্দার নানান্ জাতি লোক আসিয়া জু'টেছে ॥

সিন্ধুড়া—একতালী।

নিত্যানন্দ হরিদাস বলে ঘরে ঘরে।
"বোল কৃষ্ণ গাও কৃষ্ণ ভজহ কৃষ্ণেরে ॥
(জনম পেয়েছ ভাল) (বদন পেয়েছ ভাল)
কৃষ্ণ প্রাণ কৃষ্ণ ধন কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন ॥"
এই মত নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে।
বলিয়া বেড়ান দুই জগত ঈশ্বরে ॥
(জীবের দ্বারে ভিখারী) (জগত ঈশ্বর আজ)
দোঁহান সন্ন্যাসী বেশ যান যার ঘরে।
আথে ব্যথে আসি ভিক্ষা নিমন্ত্রণ করে।

নিতাইয়ের করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে
ধর নিতাইর চরণ দুখানি ॥

সংকর্ষণরূপী নিত্যানন্দ ও ব্রহ্মহরিদাস এই দুই জগদীশ্বর আজ অপরূপ গৌরাঙ্গলীলায় পতিতজীবের দ্বারে দ্বারে নামের ভিখারী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন আর অপরাধী জীব আপনার নিত্য স্বরূপ বিস্মৃত হইয়া দুর্দ্দৈব ও প্রকৃতির অধীন হইয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিয়া মুক্তির নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিয়া দিতেছে ও অপরাধের মাত্রা বাড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ডতারণক্ষম

নিত্যানন্দ হরিদাস বলে এই ভিক্ষা।
কৃষ্ণ বল কৃষ্ণ ভজ কর কৃষ্ণ শিক্ষা॥
অপরূপ শুনি লোক দুই জন মুখে।
নানা জনে নানা কথা কহে নানা সুখে।
কেহ দোঁহে কহে ক্ষিপ্ত কেহ চোরের চর।
ছল করি চর্চ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর॥
কেহ বলে পুন যদি শান্তি ভঙ্গ করে।
ধরিয়া লইয়া যাইব কোটালের ঘরে॥

যথারাগ—জপতাল।

সেই পথে দেখে দুই মাতোয়াল।
মহা দস্যু প্রায় দুই মদ্যপ বিশাল॥

বৈষ্ণব গোঁসাইদের নিন্দা করিতেছে। বৈষ্ণবের বার্ত্তা এমনই করিয়া আজ পর্য্যন্ত ও উপেক্ষিত হইয়েছে। বৈষ্ণবের কাঙ্গাল বেশ, বৈষ্ণবের কোমল ও মৃদু ব্যবহার, বৈষ্ণবের কাতর করুণ বাণী তমোমিশ্রিত রজোগুণের ক্ষেত্রে এমনই করিয়া উপেক্ষিত ও অবজ্ঞাত হইতেছে। বিশেষতঃ চাকর মনিব সকলে মিলিয়া ডোম চণ্ডালের গলা ধরিয়া রাস্তায় বাহির হইয়া নাচিয়া নাচিয়া 'হরি' বলিতে অনেক বৈষ্ণবম্মন্য বাবু ভায়ারা ও নারাজ।

কিন্তু বৈষ্ণবের মত অন্যানপেক্ষ অথবা অপরের ধার না ধারা লোক এ জগতে আর নাই, তাই প্রভু নিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাস অলক্ষ্যে নামের বীজ ছড়াইতে ছড়াইতে নদীয়ার সহর কোটাল জগন্নাথ ও মাধবানন্দের গৃহের দিকে চলিলেন। কতদূর যাইয়া দেখিলেন :—

সেই দুই জনার কথা কহিতে অপার।
তারা নাহি করে হেন পাপ নাহি আর॥
ব্রাহ্মণ হইয়া মদ্য গো মাংস ভক্ষণ।
ডাকাতি চুরি পরগৃহদাহ সর্ব্বক্ষণ॥
দুই জন কিলা কিলি গালা গালি করে।
নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থ কি দূরে॥*

বেহাগ—দাঁস পাড়িয়া।

শুনি নিত্যানন্দ বড় করুণ হৃদয়।
দু'য়ের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয়॥
(আরে বড় দয়াল প্রভুরে) (পাতকিভাবন নিতাই)
পাপী উদ্ধারিতে প্রভু কৈলা অবতার।
এমত পাতকী কোথা পাইবা না আর॥
তবে হম নিত্যানন্দ চৈতন্যের দাস।
এই দুইরে করো যদি চৈতন্য প্রকাশ॥ †

---

* নিতাই অগ্রসর হইয়া দুইজনের পরিচয় নাগরিকদের নিকট লইলেন।

† নিত্যানন্দ মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া হরিদাসকে জগাই মাধাইর উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিলেন—

"প্রাণান্তেও মারিল তোমা যে যবনগণে।
তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে॥"

হরিদাস নিতাইচাঁদের এই কথা শুনিয়া জগাই মাধাইর দুর্দ্দশা মোচনের জন্য তাহাদের নিকট অগ্রসর হইয়া নিতাইকে সঙ্গে লইয়া কৃষ্ণ

এখনে যে মদে মত্ত আপনা না জানে।
এই মত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে॥
মোর প্রভু বলি যদি কাঁদে দুই জন।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্য্যটন॥
যে যে জন এদুইয়ের ছায়া পরশিয়া।
বস্ত্রের সহিত গঙ্গা স্নান কৈল গিয়া॥
সেই সব জন এবে এ দোঁহারে দেখি।
গঙ্গা স্নান হেন মানে তবে মোর লেখি॥

করুণা—একতালী।

দুই দস্যু ধায় দুই ঠাকুর পালায়।
ধরিনু ধরিনু বলি নাগাল না পায়॥

নাম উপদেশ দিতে লাগিলেন। কিন্তু লুপ্তচৈতন্য দুই ভাই মদের মত্ততায় জগদ্‌গুরু হরিদাসের কথা শোনা দূরে থাকুক, অতিক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে উদ্যত হইল।

নিতাই বড় রঙ্গিয়া। আজ এক নূতন রংএর খেলা খেলিবেন বলিয়া ও ভাল মানুষ হরিদাসঠাকুরকে একটু জব্দ করিবেন বলিয়া 'বাবারে' 'মেরে ফেল্‌লেরে' বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইতে লাগিলেন, হরিদাস ও দিকপাশ না চাহিয়া নিতাইয়ের সঙ্গে দৌড়াইয়া চলিলেন; কিন্তু নিতাইয়ের অযুত হস্তীর বল আর হরিদাস তপঃক্ষাম বয়োবৃদ্ধ বৈষ্ণব, নিতাইয়ের সঙ্গে পারিবেন কেন? নিতাই হরিদাসকে পশ্চাতে ফেলিয়া শ্রীবাসের গৃহে শ্রীশ্রীপ্রভুর নিকট যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও প্রভুর দিকে না চাহিয়া শুধু হাঁপাইতে লাগিলেন; এদিকে কিয়ৎকাল পরে হরিদাস ও নিতান্ত শ্রান্ত

ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী।
মন্তের বিক্ষেপে দস্যু পড়ে গড়া গড়ি॥

বড় দাসপাঁড়িয়া॥

ভক্তগণ মাঝে বসি দ্বিজ রাজ গো'রা।
অকলঙ্ক রাকা শশী তারা গণে ঘেরা॥
(তারা ঘেরা চাঁদরে) (যেন কোটি চাঁদের হাট ব'সেছে)

ভূড়ীগৌরী—তেওট্।

শারদ চন্দ্রিকা স্বর্ণ, ধিক্ চম্পকের বর্ণ,
শোণ কুসুম গোরোচনা
হরিতাল সে কোন্ ছার বিকার সে মৃত্তিকার,
সেকি গোরারূপের তুলনা॥
ধিক্ চন্দ্রকান্ত মণি, তার বর্ণ কিসে গণি,
ফণীমণি সৌদামিনী আর।

ক্লান্তভাবে আসিয়া পৌছিলেন, নিতাইএর বিমুখ ভাব দেখিয়া প্রভু সহাস্য বদনে প্রফুল্লনয়নে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"শ্রীপাদ! আজ আমার প্রতি হঠাৎ এত বিমুখ কেন?" নিতাই অভিমানে গড় গড় করিতে লাগিলেন কিন্তু কোনই উত্তর দিলেন না। এদিকে অদ্বৈতপ্রভু প্রিয় ভক্ত হরিদাসের অবস্থা দর্শন করিয়া অতিব্যস্তভাবে ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলেন, হরিদাস আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণনা করিলেন।

(এই স্থানে প্রসঙ্গের পূর্ব্বেই গৌররূপ গাইতে হইবে।)

ও সব প্রপঞ্চরূপ, (এ) অপ্রপঞ্চ রসভূপ,
কি দিব তুলনা আমি তার ॥
যত সব বর্ণন, অনুসারে উদ্দীপন,
গোরারূপ বর্ণন কে করে।
জান না যে সেই গোরা, ধরা রূপে অঙ্গ ধরা,
দরশে ধৈরজ দূর করে ॥
শুন ওগো প্রাণ সই. জগতে তুলনা কই,
তবে সে তুলনা দিব কিসে।
জগতে তুলনা নাই, যাঁর তুলনা তাঁর ঠাই,
অমিয়া মিশাব কেন বিষে ॥
কেবা তার গুণ গায়, গুণের কে ওর পায়,
কেবা করে রূপ নিরূপন।
রূপ নিরূপিতে নারে, গুণ কে বর্ণিতে পারে,
ভাবিয়া বাউল হইল মন ॥
পক্ষী যেন আকাশের, কিছুই না পায় টের,
যত দূর শক্তি উড়ি যায়।
সেই রূপ গৌরাঙ্গের, রূপের না পায় টের,
অনুসারে এ লোচন গায় ॥

নিতাই অদ্বৈত ও মহাপ্রভুর সঙ্গে প্রসঙ্গ। নিতাই জগাই মাধাইর কথা তুলিলেন, অদ্বৈত নিতাইকে মাতাল বলিয়া গালি দিলেন, নিতাইর উক্তি।

যথা রাগ—ঝপতাল।

মাতালের কাছে মাতাল বসিয়া।
আনেরে মাতাল কহ যে ডাকিয়া॥
(বুঝি লাজ লাগেনা) (মাতাল হ'য়ে মাতাল ব'ল্‌তে)

অদ্বৈতপ্রভু স্বরূপতঃ মহাবিষ্ণু সুতরাং তাঁহারই অংশরূপী মহাদেব মাতাল।

নিতাইচাঁদ স্বরূপে বলরাম—বলাই বারুণীকান্ত সুতরাং মধুপানে ভোর মাতাল।

ইহাতে অদ্বৈতপ্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন—"আচ্ছা শ্রীপাদ! আমি না হয় মাতালই হইলাম কিন্তু প্রভুকে মাতাল বল কেমন করিয়া? অকলঙ্ক গোরাশশী তাহাতে কোন্ সাহসে এ কলঙ্ক আরোপ কর?"

নিতাই বলিলেন—"ও আবার মাতাল নয়? ও যে সবচেয়ে বড় মাতাল। কেননা যারা খুব মাতাল তারা নিজেরাই মাতলামী করে, কিন্তু ও এমন মাতাল যে যে ওর নাম শোনে সেই মাতাল হয়, যে ওর সঙ্গ পায় সেই মাতাল হয়, এমন কি যারা ওর সঙ্গীর সঙ্গ পায় তারা ও মাতাল হয়। যারা ওর নাম গায় তারা তো দিন রাত মাতাল হ'য়েই থাকে, ওর মত এত বড় মাতাল কি দ্বিতীয় আছে?"

এই কথা শুনিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু ঈষদ্ধাস্য করিয়া বলিলেন—"শ্রীপাদ! তোমার যতখুসী গালাগালি কর তবু মুখ খু'লে দুটী কথা বল, বল আজ কি ফন্দী এঁটেছ?"

তখন নিতাই বলিলেন—"ফন্দী টন্দী আমার কিছু নাই ভাই। তোমার কথা শুনে এই মাতালের হাতে প্রাণ গিয়েছিল আর কি? আর তোমার কথা এ জীবনে শুন্‌বনা এই নিবেদনটা কর্ত্তে এসেছি।"

প্রভু বলিলেন—"তা যদি আমার কোন অপরাধ হ'য়ে থাকে তো

("হরি কথা")
তুড়িগৌরী—তেওট্।

লয়ে স্বীয় সাঙ্গোপাঙ্গ, গণ সহ শ্রীগৌরাঙ্গ,
হরি নাম নগরে বিলায়।
(হরি নাম বিলায়রে) (নামের নাহি বিরাম)
(ঢালে সুধা অবিরাম)

ধানশ্রী—দাঁস পাড়িয়া।

বামে জাহ্নবী কল্লোল, তুমুল নামের রোল,
সুনীল অম্বর ভেদি ধায়॥
(শূন্য ভেদি ধায়রে) (হরি নামের তান)
(সুধু হরি নাম গান)
আগ্রে শ্রীগৌরাঙ্গ রায়, মঞ্জীর বাজিছে পায়,
ঠমকে ঠমকে চলি যায়।

দণ্ডবিধান কর তুমি ত্রিজগৎ শাসন কর আমি তো সে শাসনের অতীত নই।'

নিতাই বলিলেন—'তোমার এ লীলায় তো দণ্ড নাই, শাসন নাই প্রভো! পতিতপাবন লীলা তোমার, এই নদীয়া নগরে মহাপতিত দুই ভাইকে দে'খে তোমার নামে প্রতিজ্ঞা ক'রেছি তোমার কৃপায় আমি তাদের কৃষ্ণদাস সাজাব; আমার এই প্রতিজ্ঞা পূর্ণ কর, আমার এই বাঞ্ছা সিদ্ধ কর।" তখন ভক্তগণ সকলেই প্রভুকে এই কার্য্য অচিরাৎ সাধন করিবার জন্য ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিলেন, প্রভু 'তথাস্তু' বলিয়া বৈষ্ণব মণ্ডলীকে সাজিতে আদেশ করিলেন এবং সেই রজনীতেই শ্রীপাদ নিতাইয়ের বাসনা পূর্ণ করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ভক্ত কৃপা ব্যতীত ভগবানের কৃপালাভ সুদুষ্কর—পরন্তু ভক্তকৃপাশ্রয়

(হে'লে দু'লে যায়রে) (ললিত মধুর ঠারে)
(প্রিয় অঙ্গ অঙ্গীকারে)
রাই প্রেমে টলমল, 'রা' বলিয়ে চক্ষেজল,
'ধা' বলিতে লুণ্ঠিত ধরায়।
(ভূমে গড়ি যায় গো) (দু নয়নে বহে জল)
(রাধা প্রেমে টলমল)
কর্ণ রদ সুললিত, সর্ব্ব অঙ্গ সুগঠিত,
চারু মুখে হরি নাম গায়।
(হরি নাম গায় মা) (দুই বাহু ঊর্দ্ধে ক'রে)
(যেন কোকিলা কুহরে)॥

হইলে ভগবানের কৃপা অবশ্যম্ভাবিনী—প্রেম ধর্ম্মের এই এক বিশেষ বার্ত্তা প্রভু আপন লীলায় বিশেষ ভাবে প্রচার করিয়াছেন।

ক্রমে সন্ধ্যা সমাগত হইল, আজ নদীয়ার বৈষ্ণব মহাজনগণের আনন্দ আর ধরেনা, কেননা আজ শ্রীশ্রীপ্রভু পাষণ্ড-দলন লীলার অনুষ্ঠান করিবেন, আমার গৌরাঙ্গের পরিকর, পার্ষদ সকলেই উদ্ধারণ, "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জন", জীবদুঃখকাতর, জীবহিতব্রতী—পাতকীভাবন ঠাকুরগণ, অহর্নিশি জগতের উদ্ধার কামনাই তাহাদের ব্রত, তাই আজ মহাহর্ষে খোল করতাল সহ প্রেমানন্দে নিমগ্ন হইয়া শ্রীবাসঠাকুরের আঙ্গিনায় আসিয়া মিলিত হইলেন এবং যাহার যেমন সাধ তেমনই করিয়া দুই প্রভুকে সাজাইলেন, এবং অধীর চিত্তে প্রভুর গমনাদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন. দয়াময় প্রভু আমার উদ্ধারণের পবিত্র মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া রহিলেন এবং নিশীথকালে নদীয়ার লোক নিদ্রিত হইলে অপরূপ বাহিনী লইয়া পাষণ্ড দলনে যাত্রা করিলেন।

ছোট দশকুশী।

ললিত ত্রিভঙ্গ হয়ে, গদাধরে বামে লয়ে,
বঙ্কু অক্ষি মোহিয়া দাঁড়ায় ॥

আজ গভীর নিশীথে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র অভিন্নতত্ত্ব শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ সঙ্গে পাষণ্ডদলনে যাত্রা করিলেন। এই পাষণ্ড কে? প্রকটলীলায় জগাই মাধাই যুগল ভাই, এরা তত্ত্বতঃ কে? অনাদি কাল হইতে জীব বহির্ম্মুখ, আর অনাদি কাল হইতে লীলাপুরুষোত্তম ভগবানের সঙ্গে বহির্ম্মুখজীবের বিরোধ। যে আধারে এই বিক্ষেপ শক্তির প্রকাশ যত বেশী, সেই আধার তত বেশী বহির্ম্মুখ; মর্ত্ত্যলোকে তাহারা দৈত্য ও অসুর নামে পরিচিত। লীলাবাদীর নিকট এই সংঘর্ষটাও লীলাময়ের লীলা; নিজের যুযুৎসা প্রবৃত্তি মিটাইবার জন্য ভগবানের দৈত্যদলন বা অসুরদলন লীলা; আমাদের লীলাবাদে এবং অবতারবাদে এই দ্বন্দ্বটা নিত্য, যাঁহাদের সঙ্গে ভগবানের এই দ্বন্দ্ব তাঁহারা চিরকালই যুগল হইয়া আসিয়াছেন। কিন্তু তাঁহারা প্রভুরই অন্তরঙ্গ তাহাও শাস্ত্রকারগণ দেখাইয়া দিয়াছেন। প্রথমতঃ, মধু ও কৈটভের কথা ধরুন। যোগনিদ্রাশায়ী পরমপুরুষের কর্ণমল হইতে তাঁহারই ইচ্ছামাত্র দুই বিশালকায় মহাদৈত্যের আবির্ভাব হইল; তাঁহারা জাত মাত্রই, "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া ভগবানকে সমরে আহ্বান করিলেন; ভগবানও তথাস্তু বলিয়া তাহাদের সঙ্গে রণে প্রবৃত্ত হইলেন। পঞ্চ সহস্র বর্ষ ধরিয়া যুদ্ধ চলিল; মায়ামুগ্ধ দৈত্যযুগল ভগবানকে বলিলেন, তোমার যুদ্ধে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি তুমি বর প্রার্থনা কর। জীবচৈতন্যের পূর্ণনদ্ধাবস্থায় তমোগুণের একান্ত প্রাবল্যে জীব ভগবান্‌কে শত্রু মনে করিয়া এমনই করিয়া যুদ্ধ ঘোষণা করে! মায়াধীশ ভগবান ছল করিয়া বলিলেন—যদি তোমরা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক তবে আমার বধ্য হও; দৈত্যগণ

(কত রঙ্গ জানেন।) (রসের গৌরাঙ্গ মোর)
(রাধা প্রেমরসে ভোর)

গৌরী—একতালী।

চলিল গোরার বাহিনী।
সঙ্গে সৈন্যগণ, ভক্ত অগণন,
কাঁপায়ে চলিল মেদিনী॥
অদ্বৈত শ্রীবাস, আর হরিদাস,
গদাধর আদি সেনানী।
ব্যূহ বিরচিয়া, চলেরে নাচিয়া,
গতি কলি-প্রাণ-ঘাতিনী॥
করুণার রথে, নিতাই সারথি,
রথী শ্রীগৌরাঙ্গ-মণি।

তথাস্তু বলিয়া চতুর্দ্দিক্ জলময় দেখিয়া বলিল—"সলিলহীন স্থানে আমাদের বধসাধন করিতে হইবে।" ভগবান্ কৃপাময় স্বরূপভ্রষ্ট জীবকে টানিয়া আপন উরুদেশে উহাদের মস্তক রাখিয়া বধ করিলেন—জীবের জীবত্ব দূর হইল। সেই মহাজীবের মেদে অনন্তজীবের আবাসভূমি মেদিনীর সৃষ্টি হইল। তারপর ভগবানের বৈকুণ্ঠের দ্বারপাল জয়বিজয় জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়া হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপুরূপে যুগল হইয়া আসিলেন। ভগবান তাহাদিগকেও সংহার করিয়া জীবত্ব ঘুচাইলেন। তারপর, রাবণ, কুম্ভকর্ণ, শিশুপাল, দন্তবক্র—ত্রেতা ও দ্বাপরে আবারও সেই বিক্ষেপশক্তি যুগল হইয়া আসিয়াছে, ভগবানও সংহার করিয়া ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিয়া তাহা-দিগকে স্বরূপে মিলাইয়া আনিয়াছেন। এই যে দ্বন্দ্ব এ নিত্য। শ্রেয়ঃ

অঙ্গ উপাঙ্গ, অস্ত্র হানিয়া,
নাশিছে পাষণ্ডপরাণী ॥
(বাজে) দৃমিকি দৃমিকি রণে মৃদঙ্গ,
(ওঠে) হরি হরি জয় ধ্বনি।
এই না বাহিনী, ভুবন জিনিবে,
(দাস) গোবিন্দ কয় অনুমানি ॥

ও প্রেয়ের সঙ্গে নিরন্তর সংগ্রাম। নিঃশ্রেয়স কল্যাণরূপী ভগবান্ আর আপাতমনোরম-পরিণামদুঃখকর-ভোগপ্রিয় বদ্ধজীব প্রেয়ের মূর্ত্তি, এই দ্বন্দ্ব প্রতিজীবের জীবনে নিত্য অনুষ্ঠিত হইতেছে। প্রেয়ের পরিণাম ধ্বংস, শ্রেয়ের পরিণাম "অমৃত"॥ দেহাত্মবাদী ভোগপরায়ণ জীবের মৃত্যুর পূর্ব্বে চৈতন্য হওয়া মুস্কিল, প্রেয়ের সাধনায় ভোগের যে সংস্কার জীব অর্জ্জন করিবে তাহা কর্ম্মের দ্বারা ক্ষয় না হইলে জীবের পরমশ্রেয়লাভ অসম্ভব, ইহাই হিন্দুর ধর্ম্মের প্রাচীন সিদ্ধান্ত এবং স্বকর্ম্মের ফলভোগ না করিয়া, পাপের শাস্তি ভোগ না করিয়া, ভগবানের হাতে দণ্ড না পাইয়া—কোন অবস্থায়ই পতিত জীব স্বরূপে উঠিতে পারে না—দৈত্য সংহারের ও অসুর বিনাশের ইহাই শিক্ষা। কিন্তু আজ মধুর গৌরাঙ্গলীলায় জীবকে এক অভিনব মধুর শিক্ষা দেওয়ার জন্য শ্রীশ্রীপ্রভু এই পাষণ্ডদলনলীলার অভিনয় করিতে চলিলেন এবং জগৎকে দেখাইলেন—পরমশ্রেয়রূপী শ্রীশ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন ("শ্রেয়ঃ কৈরব-চন্দ্রিকা-বিতরণম্") সকল জীবেরই করায়ত্ত জীব অতিপতিত হইলেও শ্রীভগবানের করুণায় মুহূর্ত্ত মধ্যে "মোহান্ত পদবী" লাভ করিতে পারে; আরও দেখাইলেন হরিনামের আগে কর্ম্মফল ছাই হইয়া যায়, ভক্তের কৃপা লাভ হইলে ভগবানের কৃপালাভ অবশ্যম্ভাবী, ভগবানের কৃপা সাধন ভজন অপেক্ষা করে না; "দীনেরে অধিক দয়া করেন ভগবান" এবং যে যত বড় পতিত তাহার ত্রাণের জন্য ভগবান্ তত ব্যস্ত। তিনি শুধু

বিহাগড়া—দাস পাঁড়িয়া ॥

ওকি ধ্বনি শোনা যায় রে।
যারে মাধাই জেনে আয় (ওকি) ধ্বনি শোনা যায় রে,
(বুঝি শচীর বেটা নিমাই এল)
(ইচ্ছামত আঁখর চলিবে।)

ধানশী—জপতাল।

অধিক করয়ে নাম গুণ সংকীর্ত্তন।
বাহু তুলি হরি হরি বলয়ে সঘন ॥
পাষণ্ডহৃদয় তাহা সহিবারে নারে।
চলিলা সে দুই ভাই বাহির দুয়ারে ॥
রাঙ্গা দুনয়ন করি চলে ক্রোধ ভরে।
নাশিব সকল বৈষ্ণব নদীয়া নগরে ॥

দণ্ডদাতা নহেন—স্বরূপতঃ তিনি "উদ্ধারণ", প্রেমদাতা, শান্তিদাতা। তাই এই মধুর গৌরাঙ্গলীলায় করুণাসিন্ধু অবতার "এবে অস্ত্র না ধরিল, প্রাণে কারে না মারিল প্রেম দিয়া হৃদয় শোধিল।" অপরূপ গৌরাঙ্গ লীলার সব অপরূপ, যে ভগবান্‌কে সহস্র বৎসর, অযুত বৎসর কৃচ্ছ্র সাধনায় জীব লাভ করিতে পারে না, আজ সেই ভগবান্ পাপপূর্ণ মলিন মর্ত্ত্যভূমিতে আসিয়া পাপীর আলয় খুঁজিয়া খুঁজিয়া করুণা বিলাইতে চলিয়াছেন। তাই মহাজন বলিয়াছেন, চিরকাল চকোরই চাঁদকে ভেটিয়া থাকে, কিন্তু "প্রাণ গৌরাঙ্গের প্রেমের হাটে, চাঁদ চকোরে ভেটে।" যাকে চাই, তিনিই সবাইকে চেয়ে বেড়াচ্ছেন। বলিহারি! ধন্য গৌরলীলা!

কলির জীবের আনন্দের আর সীমা নাই। পাপীর আর চিন্তা নাই।

তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া যবে দুই ভাই চলে।
বাহু তু'লে ভক্তগণ হরি হরি বলে॥
হরি নাম দুই ভাই সহিবারে নারে।
বেগেতে ধাওয়ে তারা ভক্ত মারিবারে॥

একবার উঠ জীব! আলিসের বালিশ উপাধান ক'রে সংস্কারের প্রাসাদ নির্ম্মাণ ক'রে, প্রেমের ভূমিতে ঘৃণার গণ্ডী দিয়ে প্রাচীর গেঁথে, অভিমানের পালঙ্কের উপর স্বার্থের শয্যা রচনা ক'রে, মোহনিদ্রায় মুগ্ধ হ'য়ে অবিদ্যার কুস্বপ্ন দেখ্‌ছ, আজ এই নিশীথে একবার জাগ, জেগে দেখ, গভীর নিশার জমাট আঁধার আর কলির জীবের মনের আঁধারে আলোর ফোয়ারা ছুটিয়ে চলেছেন দুই আলোর পুতুল! দেখ্! সেই মহারাস-রসের বাদল ছুটিয়ে চলেছেন দুই বিজলীর প্রতিমা, চেয়ে দেখ্, করুণার ডালা ব'য়ে তোদের রুদ্ধদ্বারে ধাক্কা খেয়ে চলে যান আজ করুণানিধান! উঠ জীব! জাগ জীব! ঐ দেখ, সে তো চলে যায়! ঘুমের ঘোরে তার আনাগোনা; এই নিশিতেই তাঁর বাঁশী বাজে! নিশিতেই তাঁর সুচারু চরণ ভক্তের চাঁচর চিকুরে রাজে, চৈতন্য তাঁর নাম, চৈতন্যে তাঁর ধাম. যাঁরা তাঁকে পেয়েছেন, এই নিশিতেই পেয়েছেন, যারা বঞ্চিত হয়েছে তারা এই নিশিতেই বঞ্চিত হয়েছে। তাই তো কবি গেয়েছেন, "কিঘুম তোরে পেয়েছিল হতভাগিনী, সে যে পাশে এসে বসেছিল তবু জাগিনি," তিনি এম্নি ক'রেই এসে এসে ফিরে যান। মহাসিংহাসনের আসন ছেড়ে অভিসারে আসেন তিনি ধরায়, কিন্তু—দেখেন কেউ তাঁর প্রতীক্ষায় নাই, দেখেন মুক্তদ্বারে আঁধার ঘরে বাতি জ্বেলে কেউ তাঁর পথ চেয়ে নাই, দে'খে দুঃখে তিনি ফিরে যান। কিন্তু আজ আর ফিরিবেন না। আজ তিনি দ্বার ভেঙ্গে প্রবেশ কর্ব্বেন। আজ রভসালিঙ্গনে জীবকে ধন্য

বেহাগ—জপতাল।

দীন দয়ার্দ্র চিত্ত নিত্যানন্দ রায়।
অশ্রুপূর্ণ লোচনেতে দোঁহা পানে চায়॥
জগাইর মন অমনি দরবিয়া গেল।
স্তম্ভিত হইয়া সে দাঁড়াইয়া র'ল॥

কিন্তু মাধাই—

বেহাগ—জপতাল।

কলসীর কাণা সে ফেলিয়া মারে রোখে।
নির্ভরে লাগিল নিত্যানন্দের মস্তকে॥
ফুটিল মুটকী শিরে রক্ত পড়ে ধারে।
গৌর বলি নিতাই আনন্দে নৃত্য করে॥

কর্ব্বেন ব'লে রসিক শিরোমণি আজ নবীননাগরবেশে পাষণ্ডের দ্বারে মহাসমারোহে সমাগত! জীব একবার সাধন নেত্রে এই মধুর মিলন চেয়ে দেখ, তোমার সকল খেদ মিটে যাবে!

*

সপরিকরে কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু জগাই মাধাইর বহিরঙ্গনে উপনীত। উদ্দণ্ড তাণ্ডব নৃত্য—উচ্চরোলে ভক্তকণ্ঠে নামের রোল—সে ধ্বনি কি আজ মরমে না পশিয়া থাকিতে পারে। তাই কৃপাজ্যেষ্ঠ জগাই আগে সে ধ্বনি শুনিয়া মাধাইকে উঠাইয়া বলিলেন—

"ও কি ধ্বনি শোনা যায় রে আজ ইত্যাদি।"

(তখন নিতাই বলিলেন)

মারিলি কলসীর কাণা সহিবারে পারি।
তোদের দুর্গতি আমি সহিবারে নারি॥
মেরেছিস্ মেরেছিস্ তোরা তাহে ক্ষতি নাই।
সুমধুর হরি নাম মুখে বল ভাই॥

এদিকে নিতাইর অঙ্গে রক্ত ধারা দেখিয়া—

প্রেম ভরে মহাপ্রভু নিতাই কোলে নিল।
আপন বসন দিয়া রক্ত মোছাইল॥

ধ্বনি ক্রমেই স্পষ্টতর হইয়া কাণে পশিতে লাগিল। আজ তাঁদের অন্তর অত্যন্ত অস্থির! দুই ভাই ক্রুদ্ধ হইয়া নিষেধবার্ত্তা-সহ দূত পাঠাইলেন, কিন্তু সে নুনের পুতুল সমুদ্রে যাইয়া আর ফিরিতে পারিল না। কেননা সেই ঈশ্বর মুখে হরিনাম শুনিয়া দূত বেহাল হইয়া কাঁদিতে লাগিল আর গড়াগড়ি যাইতে লাগিল। * * * * কিয়ৎকাল অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন যে দূত আর ফিরিয়া আসিল না, তখন দুই ভাই রুদ্র মূর্ত্তিতে বাহিরে আসিয়া বৈষ্ণবগণকে তাড়ন করিতে লাগিলেন ইহা দেখিয়া

"অধিক করয়ে তাঁরা নাম সংকীর্ত্তন।"

* * * *

এদিকে নিতাইর মস্তকে ক্ষত ও শ্রীঅঙ্গে রক্তধারা দেখিয়া শ্রীশ্রীপ্রভু গৌরচন্দ্র 'সুদর্শন' 'সুদর্শন' বলিয়া হুঙ্কার করিলেন। সুদর্শনের আবির্ভাব ও প্রভুর বন্দনা। প্রভু সুদর্শনকে আদেশ করিলেন—"এই পাষণ্ড শ্রীপাদ নিত্যানন্দের রক্তপাত করেছে ইহাকে সংহার কর"। সুদর্শন শ্রীশ্রীপ্রভুর আজ্ঞা পালন করিতে উদ্যত হইলেন—

"দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।"

দয়ার সাগর মোর নিত্যানন্দ রায়।
না মারিহ বলি সুদর্শন কে রহায়॥
দণ্ডবৎ হইয়া পড়ে প্রভুর চরণে।
"এই দুই পতিত প্রভু মোরে দেহ দানে॥
আর যুগে যুগে দৈত্য করিলা উদ্ধার।
সশরীরে এই দুইয়ের করহ নিস্তার।"
শুনি নিত্যানন্দ বাণী প্রভু গৌর চন্দ্র।
কাঁদিতে লাগিলা কোলে করি নিত্যানন্দ॥
প্রভু বলে, "নিত্যানন্দ ! পতিত পাবন।
তোরে ভজিলে সে জীব পায় প্রেমধন॥
একবার নিত্যানন্দ বলে জন্ম ধরি।
সে জন পবিত্র হৈল সে লোক আমারি॥"

ওদিকে নিতাইর মস্তকে ও শ্রীঅঙ্গে রক্তধারা দেখিয়া মাধাইর নির্ম্মম প্রাণে একটা শোকমিশ্রিত অনুতাপ আরম্ভ হইয়াছে, একটু একটু ভয় ও হইয়াছে। ভীতভাবে জগাইর নিকট যাইয়া বলিলেন, "জগা! চল্ ঘরে যাই, আর এখানে থেকে কাজ নাই, এ বেটারা আজ মাতাল হয়ে এসেছে, এদের সঙ্গে আজ আর পারা যাবে না।" এই বলিয়া জগার মুখের দিকে চাহিয়াই মাধাই চমকিয়া উঠিলেন! দেখিলেন—জগাইর বুক বহিয়া অশ্রু ঝরিতেছে। জগাই ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছেন, কিয়ৎকাল পরে দুই হাতে চক্ষু মুছিয়া জগাই মাধাইকে বলিলেন—

"আমি আর তো যাব না ঘরে ইত্যাদি।"

আজ দয়াল নিতাই চাঁদের কৃপায় পাষাণ ফাটিয়া জলের উৎস ছুটিয়াছে।

গৌরী—দাস পাঁড়িয়া।

আমি আর ত যাবনা ঘরে।
দয়াল নিতাই সনে, পাগল হইয়া,
মাগি খাব দ্বারে দ্বারে॥
যে ঘরের সুখের, আশায় মজিয়া,
ডুবিনু পাপের সাগরে।
সে ঘর দুয়ারে লাগিলেও আগুন,
আর না চাহিব ফিরে॥
আনন্দের লাগি, মাতাল হইয়া,
ও তা পাইনি জীবন ভ'রে।
আজ হরিনামের মদে, মাতাল করি নিতাই,
(মোরে) ডুবাল আনন্দ সাগরে॥
আপন সুখের ওজন বাড়াতে
পীড়িয়াছি যারে যারে।
আজ নিতাই নিতাই বলি, কাঁদিয়া বেড়াব
তা' সবার দ্বারে দ্বারে॥

নিত্যানন্দের কৃপায় জগাইর উদ্ধার। মাধাইর চৈতন্য ও আক্ষেপ। নিত্যানন্দের পদমূলে মাধাইর পতন।

"জগাইর সৌভাগ্য দেখি—"

নিতাই তখন প্রভুর পায়ে মাধাইকে ধরিয়া দিলেন।

"প্রভুর চরণে, লুটাইয়া কাঁদে…"

দাস গোবিন্দে কহয়ে আনন্দে
শোন্ মাধা বলি তোরে।
নদী যদি পায় সাগর সঙ্গ
সে কি ফিরে যেতে পারে॥

ধানশ্রী—দাস পাড়িয়া।

জগাইর সৌভাগ্য দেখি কাঁদিয়া কাঁদিয়া।
নিত্যানন্দের পায়ে মাধাই পড়ে লুটাইয়া॥
(ওহে পতিতপাবন ঠাকুর) (মোরে দয়া কর হে)
(আমি কি এমনি রব রে) (এমন পতিত পাবন অবতারে)
(ইচ্ছামত আখর চলিবে)

জয়জয়ন্তী—দোঠুকী।

প্রভুর চরণে, লুটাইয়া কাঁদে
(হয়ে) দুই ভাই গলাগলি।
রোদন শুনিয়া পাষাণের প্রাণ,
জল হ'য়ে যায় গলি॥
(দেখি) বৈষ্ণব সকল, কাঁদিয়া বিকল,
প্রভু পদে সবে কহে।
ওহে পতিত পাবন, ও রাঙ্গা চরণে,
স্থান দেও এই দোঁহে॥

যথারাগ।

প্রভু বলে এই দুই পাষণ্ড নহে আর।
আজি হ'তে এই দুই সেবক আমার॥

সভে মিলে অনুগ্রহ কর এ দুয়েরে।
জন্মে জন্মে আর যেন না পাশরে মোরে ॥
দুজনার শরীরেতে পাপ নাহি আর।
ইহা বুঝাইতে হইলা কালিয়া আকার ॥
ব্রহ্মদৈত্য উদ্ধারিল নিমাই বিশ্বম্ভর।
ধন্য ধন্য পৈল সর্ব্ব নদীয়া ভিতর ॥
(তখন) মহানন্দে পুনঃ আরম্ভিয়া সংকীর্ত্তন।
হরি হরি ব'লে নাচে যত ভক্তগণ ॥

ইতি পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীপ্রভু তখন দুইজনকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইলেন এবং ভক্তগণকে বলিলেন—"প্রভু বলে······"

সর্ব্বশেষে প্রভু জগাই মাধাইকে আলিঙ্গন করিয়া পাপগ্রহণ করিলেন।

নিমাই সন্ন্যাস ।

অথ বন্দনা

সুহই—জোতসোম তাল।

জয় জয় জগন্নাথ শচীর নন্দন।
ত্রিভুবন করে যার চরণ বন্দন॥
নীলাচলে শঙ্খ চক্র গদা পদ্মধর।
নদীয়া নগরে দণ্ড কমণ্ডলু কর॥
কেহো বলে পূরবেতে রাবণ বধিলা।
গোলোকের বৈভব লীলা প্রকাশ করিলা॥
শ্রীরাধার ভাবে এবে গোরা অবতার।
হরে কৃষ্ণ নাম গোরা করিলা প্রচার॥
বাসুদেব ঘোষ বলে করি যোড় হাত।
যেই গৌর সেই কৃষ্ণ সেই জগন্নাথ॥

অথ পালা আরম্ভ

মায়ুর রাগ—ঝাঁপতাল।

করিনু পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে॥
(কফ বেড়ে যে গেল রে) (নিবারণ দূরে রহু)

শ্রীশ্রীধাম নবদ্বীপে কিশোর গৌরাঙ্গ সুন্দর শচীর দুলালরূপে আনন্দের খেলা খেলিতেছেন; তদবস্থায় পিতৃবিয়োগ হইলে প্রভু ৺গয়াধামে গয়াকার্য্য করিতে গিয়াছিলেন, তথায় গদাধরের পাদপদ্ম দর্শনে যে ভাবের বন্যা

ধানশী—একতালী।

জীব নিস্তারিতে আমি কৈনু অবতার।
উদ্ধার দূরেতে থাকুক করিনু সংহার॥

উঠিয়াছে, মহাভাবনিধি স্বয়ং তাহাতে হাবুডুবু খাইতেছেন। প্রভুর ক্ষণে বাহ্য, ক্ষণে বিহ্বল দশা; কখনও দীনহীন ভাবে পরমার্ত্তি করিতেছেন, যাঁহাকে দেখেন তাঁহারই কৃপা প্রার্থনা করিতেছেন 'কৃষ্ণ হে প্রাণনাথ! দেখা দাও' বলিয়া মর্ম্মভেদী রোলে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন; আহার নাই, নিদ্রা নাই, দিবানিশি জ্ঞান নাই; এমন সময় একদিন প্রভু বসিয়া "গোপী গোপী" নাম জপ করিতেছেন দেখিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপের এক বিখ্যাত পড়ুয়া (কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ) প্রভুকে অপ্রকৃতিস্থ মনে করিয়া উপদেশ দিতে লাগিলেন। "পণ্ডিত! প্রকৃতিস্থ হও, অশাস্ত্রীয় নাম কেন লইতেছ? তারকব্রহ্ম নাম জপ করিতে তা বেশ ছিল, কৃষ্ণনাম লইলে ফল আছে, কিন্তু গোপীনাম জপ করিয়া কি হইবে: এ নাম জপেরও তো কোন বিধান কোথায়ও দেখি না, কেন এ পণ্ডশ্রম করিতেছ?" প্রভু তখন ভাবাবিষ্ট; বামা প্রেয়সীর অনুগতা সখীর ভাবে বিভোর—কাজেই উক্ত পড়ুয়ার কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি ও নিঠুরের নাম আর লইব না। যে স্ত্রীজিৎ সাজিয়া ত্রেতাযুগে স্ত্রীলোকের নাক কাণ কাটিয়াছিল, যথাসর্ব্বস্ব নিবেদন করিয়া যাঁহারা একান্তে শরণ লইয়াছিলেন এমন গোপীদের প্রাণে অশনি হানিয়া যে শঠ, লম্পট কপটাচরণ করিয়া আসিব বলিয়া চলিয়া গেল আর আসিল না আমি সে নিঠুরের নাম আর লইব না। তৎপরিবর্ত্তে যাঁহারা অষ্টপাশের জঞ্জাল ছেদন করিয়া 'প্রভো তোমার হলেম, বলিয়া সেই নিঠুরের জন্য কুল শীল সকল বিসর্জ্জন দিয়া কলঙ্কের হার গলায় পড়িয়াছিলেন এবং সেই লম্পট নিষ্পীড়িত অলক্তের মত তাহাদিগকে ছাড়িয়া চলিয়া গেলেও যাঁহারা 'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া

অপরাধ দূরে রহু আরো অপরাধী হৈল।
তাপ দূরে রহু জীব মহাপাপে ডুব্‌ল॥

গৌরী—একতালা।

নিতাই ঐ বুঝি শোনা যায়।
কলির জীবের রোদন ধ্বনি—
ঐ বুঝি শোনা যায়।

কাঁদিয়া কাঁদিয়া দেহপাত করিয়াছিলেন,—সেই প্রেমের পুতলী মহিমময়ী গোপিকার নাম আমি শতমুখে গান করিব। সাবধান! আমার ইষ্টনাম জপে কেহ বাধা দিওনা। প্রভুর ঈদৃশ বাক্য শুনিয়া উক্ত পড়ুয়া পুনরায় প্রভুকে 'গোপী' নামের অশাস্ত্রীয়তা ও অলৌকিকতা সম্বন্ধে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলে প্রভু ভাবাবিষ্ট অবস্থায় যষ্টি হাতে লইয়া পড়ুয়াকে মারিতে উদ্যত হইলে পড়ুয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিয়া পড়ুয়ামণ্ডলীতে উপস্থিত হন। তথায় সকল পড়ুয়া ব্রাহ্মণগণ নিমাই পণ্ডিতকে প্রহার করিবার ষড়যন্ত্র করে এবং এই ষড়যন্ত্রের কথা ক্রমে ক্রমে শ্রীপাদনিত্যানন্দের কাণে উঠিলে তিনি প্রভুকে একটু সাম্‌লাইয়া চলিতে উপদেশ দেন। সেই সময় প্রভু একদিন হঠাৎ হাস্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

"করিনু পিপ্পলীখণ্ড কফ নিবারিতে।"

(শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত দ্রষ্টব্য।)

শ্রীশ্রীপ্রভু ভক্তগণ মাঝে উক্ত কথা বলিলেন বটে কিন্তু একমাত্র নিতাই ভিন্ন উহা আর কেহ বুঝিতে পারিলেন না। নিতাই চাঁদ উক্ত কথা শুনিয়াই প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিবার জন্য একান্তে অপেক্ষা করিলেন— অন্যান্য ভক্তগণ প্রভুর নিকট হইতে বিদায় হইলে নিতাই প্রভুকে উক্ত হেঁয়ালীর উদ্দেশ্য জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু বলিলেন—"নিতাই! আর আমি এঘরে থাকব না।" নিতাই বজ্রাহত প্রায় কম্পিত হইয়া উঠিলেন এবং

(আমি আর ত ঘরে রইতে নারি)
(জীবের দুঃখ মোরে পাগল কৈল রে)
(মরম ভেদিয়া উঠিছে রে রোল—)
সঙ্গতি মত আঁখর চলিবে।
বিভাষ—বড়দাসপাঁড়িয়া।
নয়নের তারা মোর কুলের প্রদীপ।
তোমা পুত্রে ভাগ্যবতী বোলে নবদ্বীপ ॥
(আমার এই তো ভাগ্য রে)
(আমি নিমাই হেন পুত্রের মাতা।)

কাতরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কেন ভাই! মায়ের বুকে শেল হানিয়া কেন ভাই যাবি।" প্রভু বলিলেন, "নিতাই! কেন যাব? ঐ শোন—
"ঐ বুঝি শোনা যায়।..."

নিতাই বলিলেন—"তা' ঘর ছেড়ে গেলে কি হবে!"

প্রভু—"নিতাই! আজ যারা অভিমানে আমার কথা শুন্‌ছে না; ঈর্ষা ও দ্বেষে জরজর হ'য়ে নদীয়ার প্রতিষ্ঠাশালী অধ্যাপক নিমাই পণ্ডিতের কথা কাণে তুল্‌ছে না, আমি সন্ন্যাসী সেজে কাল তাদের দ্বারে ভিখারী হ'য়ে দাঁড়াব। চক্ষে জল, হাতে করঙ্গ, পরণে কৌপীন, গায়ে ছেঁড়া কাঁথা লয়ে সর্ব্বস্ব ত্যাগ ক'রে কাঙ্গাল হ'য়ে তাদের দ্বারে যেয়ে যখন তাদের মঙ্গলের জন্য তাদের কাছে কথা বলব, তখন তারা শুন্‌বে—অন্ততঃ সন্ন্যাসীর বেশ দেখে জগদ্‌গুরু-বোধে প্রণামটাও তো কর্‌বে—তাতেই জীবের উদ্ধার হবে। যে কোন প্রকারে আমার উপর জীবের ভাল ভাব এলেই, যে কোন ভাবে আমার উপর নত হ'লেই জীবের কল্যাণ হবে। ভাই! তাই আমি আর ঘরে থাকব না, নিশ্চয়ই কাঙ্গাল সাজ্‌ব।

ধানশী—জপতাল।

ভাগ্য করি মানে লোক দেখি মোর মুখ।
এখন আমারে দেখি হইবে বিমুখ॥
তুমি হেন পুত্র মোর এ সংসারে ধন্য।
তোমা না দেখিলে মোর সকলি অরণ্য॥
দুঃখ দিয়া অভাগীরে ছাড়ি যাবে তুমি।
গঙ্গায় প্রবেশ করি মরিব রে আমি॥
এ হেন কোমল পায়ে কেমনে হাটিবে।
ক্ষুধায় অন্ন তৃষ্ণায় জল কাহারে মাগিবে॥
ননীর পুতলী তনু রৌদ্রেতে মিলায়।
কেমনে সহিব ইহা এ দুঃখিনী মায়॥

এই যে প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের সঙ্কল্প নিতাই প্রমুখাৎ ক্রমে ক্রমে নদীয়ার অন্তরঙ্গ ভক্তগণ অবগত হইলেন এবং নিতাই শচীমাতাকে ইহা জ্ঞাপন করিলেন। মা ইহা শুনিয়া শোকে অধীর হইয়া "নিমাই নিমাই" বলিয়া কাঁদিতে লাগিলেন, হেনকালে বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর নগর ভ্রমণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, মা আমার অগ্রসর হইয়া নিমাইকে বুকে ধরিয়া চাঁদ মুখে চুমো খাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

"নয়নের তারা·········প্রদীপ।"

প্রভু লীলায় এ কথা জানিতেন না যে মায়ের কাণে এ কথা উঠিয়াছে। তাই নিতান্ত অপ্রস্তুত হইয়া মাকে বলিলেন—'মা চল ঘরে যাই; কি হ'য়েছে মা! কেন এত অধীর হ'চ্ছ আমি তো যাই নাই।" মা এ কথা শুনিয়া প্রভুর অভিপ্রায় অবগত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—

"ভাগ্য করি মানে লোকে···।

হাপুতির পুত আমার সোণার নিমাই।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যাবে কোন ঠাঁই ॥ *

বেহাগ—একতালী।

সন্ন্যাস করিব কৃষ্ণ প্রেমের কারণে।
দেশ বিদেশ হৈতে আনি দিব প্রেমধনে ॥
আনের তনয় আনে রজত সুবর্ণ।
খাইলে বিনাশ পায় নহে কোন ধর্ম্ম ॥ †

* শচীমাতা এমন ভাবে কাঁদিতে আরম্ভ করিলেন যে শুনিলে পাষাণেরও প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া যায়; কিন্তু প্রভু পুষ্প হইতে সুকোমল হইয়াও বজ্রাদপি কঠোর, সুতরাং মার চোখের জলে তাঁহার কর্ত্তব্যের গতি রোধ করিতে পারিল না। প্রভু মায়ের অশ্রু মুছাইয়া ধীর, স্থির, অকম্পিত স্বরে গম্ভীরভাবে বলিলেন—"মা! আমি যাব ব'লেই স্থির করেছি কিন্তু তোমার অনুমতি না ল'য়ে যেতাম না। তবে যখন তুমি আগেই শুনেছ, তবে আজই আমি তোমার অনুমতি ভিক্ষা কর্চ্ছি। মা! আমি তোমার সন্তান, আমি ধর্ম্ম সাধনার্থ প্রবাসী হ'তে চাই তুমি আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও। মা! সকলেরই প্রাপ্তবয়স্ক পুত্র উপার্জ্জনের আশায় বিদেশে যায়। আমিও উপার্জ্জনের জন্য গৃহত্যাগ করব; কিন্তু সকলের ছেলে নশ্বর ধন আন্‌তে যায়—আমি অবিনাশী ধন কৃষ্ণপ্রেম এনে তোমায় দিব। মা! আমায় হাসিমুখে বিদায় দাও।"

† প্রভুর এ কথা শুনিয়া শচীমাতা সন্তানের সংকল্পের দৃঢ়তা বুঝিতে পারিলেন; মাতারই তো সন্তান—মাতা পুত্র উভয়েই উভয়কে ভাল রকম চিনিতেন। বিশেষতঃ, যাঁহার উদরে বিশ্বম্ভর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি তো সাধারণ রমণীর মত স্নেহান্ধা নহেন। তিনি যে নিমাই হেন

যেদিন দেখিতে মোরে চাহিবে অনুরাগে।
সেইদিন তুমি মোর দরশন পাবে॥

পুত্রের মাতা, সুতরাং পুত্রের ধর্ম্মসাধনের সংকল্পে বাধা দিতে পারিলেন না। সুধু বলিলেন "বাপ আমার, আমি তো কোন দিন তোর ধর্ম্মকার্য্যে হস্তক্ষেপ করি নাই; এতদিন যেমন ক'রে এসেছ, তেমনই ক'রে ঘরে বসে হরিনাম কল্লে কি হবেনা বাপ! নদীয়ায় তোমার কত সঙ্গী, তাঁদের ল'য়ে যেমন তুমি হরি ব'লে নেচে বেড়াতে, তেমনই ভাবে নেচে গেলে বেড়াও। কিন্তু বাপ! বৃদ্ধবয়সে এই অভাগিনীকে দর্শনসুখে বঞ্চিত করো না। নিমাই! আমার মত এমন দুঃখিনী আর জগতে কেউ নাই। একটী একটী করে সাতটী কন্যা আমি খেয়েছি, তারপর তোরই মত অপরূপ সোণার পুতুল আমার বিশ্বরূপ অভাগিনীর এই ভাঙ্গা কুটীর আলো করে এসেছিল; তোরই মত সে নাচ্‌ত, খেল্‌ত, হাস্‌ত। যে পথ দিয়ে যেত, আনন্দের লহর খেলে যেত, এমনই সর্ব্ব বিদ্যায় বিশারদ হ'য়ে নদীয়ায় অপূর্ব্ব ছটায় শোভা পেত আমার বিশ্বরূপ; যে একবার তার সঙ্গ পেত, প্রতিদিন তাকে খুঁজে বেড়াত; এমন ছেলের মা বলে নদীয়ায় আমার শ্লাঘার আর সীমা ছিল না। নদীয়ার নরনারী সকলে আমাকে ধন্য ধন্য কর্‌ত। কিন্তু বাপ! এ রাক্ষসীর পোড়া কপালে এত সুখ সইল না; হঠাৎ একদিন আমার সে সুখের সাগর শোকের আগুনে শুকিয়ে গেল। সেই জ্বালাময় প্রাণে শান্তির উৎস ছুটিয়ে তুই এসেছিস্, শোকার্ত্তা শচীর প্রাণ আবার ভ'রে উঠ্‌ল আনন্দে, সব ভুলে গেলাম সেই সুখে ঘর সংসার কত্তে কর্ত্তে, পতিদেবতাকে হারালেম, প্রাণ রাখলেম তোমার মুখ চেয়ে। বাপ্‌রে! এত শোকে জর জর আমার প্রাণ, তুমি ফেলে গেলে আর এ দেহে থাকবে না। কেননা ঐ মুখখানা দেখেই এ প্রাণ ধরে রয়েছি। নিমাই! তোমার ধর্ম্মে বাধা, জীবন

বিষ্ণুপ্রিয়া-সংবাদ

রজনী বিলাস

॥ ভজন—দাস পাঁড়িয়া ॥

চরণ কমল পাশে, নিশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারয়ে কাতর বয়ানে।
হৃদয় উপরে থুঞা, বান্ধে ভুজলতা দিয়া,
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥
ছুনয়নে ঝরে নীর, ভিজিল হিয়ার চীর,
চরণ বহিয়া পড়ে ধারা।
চেতন পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার পুছে অভিপারা ॥

গেলেও দিবনা, কিন্তু বাপ! বৃদ্ধা মাকে অদর্শন শেলে বধ না ক'রে কি ধর্ম্ম সাধন কর্ত্তে পার না।" নিমাই বল্লেন—মা! আমি যেখানেই থাকি না কেন, তুমি যখনই আমাকে দেখিতে চাহিবে, তখনই আমাকে দেখিতে পাইবে। কেননা আমি চারিস্থানে নিত্য বর্ত্তমান—

"নিতাই নর্ত্তনে, রাঘব প্রাঙ্গনে, (আছি)
শচীররন্ধনে আর শ্রীবাস কীর্ত্তনে।"

এদিকে এই সর্ব্বনাশী বার্ত্তা অন্তরালে থাকিয়া দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শুনিলেন; কিন্তু লজ্জাবতী লতার মত লজ্জাশীলা বধূ বিষ্ণুপ্রিয়া মুখ ফুটিয়া প্রভুকে এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে সাহস পাইলেন না। মনে মনে ভাবিলেন, হয়ত প্রভুই এ কথা তাঁহার নিকট উত্থাপন করিবেন। কিন্তু যখন প্রভু এ সম্বন্ধে দেবীকে কিছুই বলিলেন না, তখন একদিন সাহসে বুক বাঁধিয়া ভক্তজননী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভু নিদ্রিত হইলে প্রভুর শ্রীচরণ সমীপে যাইয়া বসিলেন।

মিশ্র গৌরী—একতালী।

ধিক্ রহু মোর দেহে, এক নিবেদন তোঁহে
কেমনে হাটিয়া যাবে পথে।
শিরীষ কুসুম হেন, সুকোমল চরণ,
পরশিতে ডর লাগে হাতে॥
ভূমিতে দাঁড়াহ যবে, ডরে প্রাণ হালে তবে,
সিঞ্চিড়া পড়য়ে সর্ব্বগায়।
অরণ্য কণ্টক বনে, কোথা যাবে কোন স্থানে,
কেমনে হাটিবে রাঙ্গা পায়॥
সুধাময় মুখ ইন্দু, তাহে ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু,
অলপ আয়াসে মাত্র দেখি।
বরিষা বাদল বেলা, ক্ষণে বা বিষম খরা,
সন্ন্যাস করয়ে মহা দুখী॥*

প্রভু জাগরিত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়াকে রোরুদ্যমানা দেখিয়া তাঁহার রোদনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে, দেবী গুছাইয়া কোন কথা বলিতে পারিলেন না, কোন কথার অবতারণা না করিয়াই বলিয়া ফেলিলেন—"প্রভো! তুমি কেমন করিয়া সন্ন্যাসী সাজিয়া যাইবে?"

* প্রভু বিষ্ণুপ্রিয়ার মুখে আচম্বিতে একথা শুনিয়া একটু অপ্রতিভ হইলেন, কেননা প্রভু তাঁহাকে বলিবার আগেই তিনি শুনিয়া ফেলিয়াছেন অথচ প্রভুর কর্ত্তব্য ছিল ভার্য্যাকে একথা বলা। কিন্তু যখন শুনিয়াই ফেলিয়াছেন, তখন কি করিয়া দেবীকে প্রবোধ দেওয়া যায় ইহা ভাবিয়া স্থির করিবার সময় আর প্রভু পাইলেন না;

খরা—রৌদ্রতাপ।

॥ ছোট দশকুশী—সুহই ॥

জগতে যতেক দেখ, মিছা করি সব লেখ,
মিছা করি করহ গেয়ান।
মিছা পতি সুত নারী, পিতা মাতা যত বলি,
পরিণামে কে হয় তাহার ॥

॥ বরাড়ী—একতালী ॥

শ্রীকৃষ্ণ চরণ বহি, আর ত কুটুম্ব নাহি,
যত দেখ সব মায়া তার ॥
কি নারী পুরুষ দেখ, সভারি সে আত্মা এক,
মিছা মায়াবন্ধে হয় দুই।
শ্রীকৃষ্ণ সভার পতি, আর সব প্রকৃতি,
এ কথা না বুঝয়ে কোই ॥

"শুনি বিষ্ণুপ্রিয়া বাণী, প্রভু গৌর গুণমণি
হাসিয়া তুলিয়া কৈল কোলে।
বসনে মুছায় মুখ, করে নানা কৌতুক
মিছা শোক না করিহ বোলে ॥

কিন্তু এ সব কথায় বিষ্ণুপ্রিয়াকে প্রবোধ দিতে না পারিয়া রসরাজ আজ আচার্য্য সাজিয়া পত্নীকে উপদেশ দিতে লাগিলেন।

এই ভাবে প্রভু আমার—

"আপনে ঈশ্বর হঞা, দূর করে নিজ মায়া
বিষ্ণুপ্রিয়া পরসন্ন চিত।"

কিন্তু তবু বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর মায়ার মুগ্ধা না হইয়া চরণতলে লুটাইয়া কাঁদিয়া বলিলেন—"প্রভো! আমি অতি ছার রমণী, তোমার দাসী হইয়া তোমার

কৃষ্ণ ভজিবার তরে, দেহ ধরি এ সংসারে
মায়াবন্ধে পাসরে আপনা।
অহঙ্কারে মত্ত হৈয়া, নিজ প্রভু পাসরিয়া
শেষে মরে নরক যন্ত্রণা॥
তোর নাম বিষ্ণুপ্রিয়া, সার্থক করহ ইহা,
মিছা শোক না করিহ চিতে।
এ তোরে কহিনু কথা, দূর কর আন চিন্তা,
মন দেহ কৃষ্ণের চরিতে॥

॥ যথারাগ—জপতাল॥

যায় যায় যায়, ফিরে ফিরে চায়
প্রেয়সী বদন পানে।
সুশীলা সরলা, অখলা অবলা,
নিদ্রায় অচেতনে॥

সেবারূপ যে মহাসম্পদ পাইয়াছিলাম তাহা কেন যাবে? আমার কি অপরাধ তাই বল? প্রভু তখন কিছুতেই বিষ্ণুপ্রিয়াকে বুঝাইতে না পারিয়া বলিলেন—

"আমি যথা তথা যাই, থাকিব তোমার ঠাঁই
এই সত্য কহিলাম দৃঢ়।

"প্রিয়ে তুমি কেঁদনা—তোমার এ সেবাসুখে তোমাকে বঞ্চিত করিব না, এই আমার প্রতিজ্ঞা।"

বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর এই কথায় আশ্বস্তা হইলেন। রাত্রি প্রভাত হইল, দেবীর মনের সে আশঙ্কা প্রভুর ইচ্ছায় দূর হইয়া গেল। তারপর কিয়ৎ-

কত দূর যাইয়া, থমকি দাঁড়াইয়া
আবার ফিরিলা ঘরে।
অমিয়া উগারি, নয়নে নেহারি,
রহিল পিয়ার শিরে।।

কাল প্রেমময় প্রভু প্রীতির তরঙ্গে সকলকে ডুবাইয়া ফেলিলেন। জননী ভার্য্যা, ভক্তগণ, যে যে ভাবে সন্তুষ্ট থাকেন সেইভাবের ব্যবহার করিয়া প্রভু সকলকে ভুলাইয়া রাখিতে লাগিলেন। প্রভু যাওয়ার পূর্ব্বে পূর্ণরূপে সংসারী সাজিলেন। সদা প্রফুল্ল, হাস্যকৌতুকময়। অপূর্ব্ব বেশভূষা ধারণ করিয়া স্বচ্ছন্দে নগর ভ্রমণ করিতে লাগিলেন, পরম রসিক নাগর রূপে ভার্য্যাসহ ব্যবহার করিতে লাগিলেন, নদীয়ার আপামর সকলের ধারণা হইল প্রভু সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করিলেন। দেখিতে দেখিতে মাঘ মাসের শুক্লপক্ষ আসিয়া উপস্থিত হইল, প্রভু সময় প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন; চব্বিশ বৎসর বয়সে মাঘী সংক্রান্তির পূর্ব্বরাত্রে প্রভু বিচিত্র নাগরবেশ ধারণ করিয়া বিলাস মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মনের সাধ মিটাইয়া কুসুমাভরণে চন্দনানুলেপনে প্রভুকে সাজাইলেন, রসিক শিরোমণি গৌর গুণমণিও "বিষ্ণুপ্রিয়া অঙ্গে বেশ করেন আপনি।"

"দীর্ঘকেশ কামের চামর জিনি আভা।
কবরী বাঁন্ধিয়া দিল মালতীর গাভা॥
মেঘ বদ্ধ হৈল যেন চাঁদের কলাতে।
কিবা উগারিয়া গিলে না পারে বুঝিতে॥
সুন্দর ললাটে দিল সিন্দুরের বিন্দু।
দিবাকর কোলে যেন রহিয়াছে ইন্দু॥

ঝর ঝর ঝর, বহিল বাদর,
গোরার রাজীব নয়নে।
তাপিত জীবের, তাপ কোলাহল,
অমনি পশিল কাণে॥

॥ ভজন—দাস পাঁড়িয়া॥

অখিল জীবের দুঃখে, ছাই দিয়া তোর সুখে,
সন্ন্যাস লইতে চলুঁ আমি।
অপরাধ না লইহ, কৃষ্ণ সুখে সুখী রহ,
রহ প্রেমে মাতি দিবাযামী॥

সিন্দুরের চৌদিকে চন্দন বিন্দু আর।
শশি কোলে সূর্য্য যেন ধায় দেখিবার॥

* * *

নানা অলঙ্কারে অঙ্গ ভূষিল তাহার।
তাম্বুল হাসির সঙ্গে বিহরে অপার॥

* * *

বুকে বুকে মুখে মুখে রজনী গোঙায়।
রস অবসাদে দোঁহে সুখে নিদ্রা যায়॥ (শ্রীশ্রীচৈতন্য মঙ্গল)

এমন সুখের রজনী ভোর হইতে না হইতে স্বতন্ত্র ভগবান গৌরাঙ্গ সুন্দর সন্ন্যাস লইতে কৃতসংকল্প হইয়া উঠিলেন। উঠিয়া "যায় যায় যায়।"

অনন্ত জীবের দুঃখে যাহার বুকে করুণার সিন্ধু উথলিয়া উঠে, বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখে ও তাঁহার প্রাণ নিশ্চয়ই কাঁদে, তাই প্রভু যাওয়ার বেলা কাঁদিলেন; তিনি অখিল জীবের বন্ধু, বিষ্ণুপ্রিয়াও তাঁহারই নিজজন—তাঁহার হৃদয়ের কোণে বিষ্ণুপ্রিয়ারও একটু ঠাঁই আছে। সুতরাং

মিশ্রসিন্ধু—একতালা।

সুরধুনীর তীরে কেরে হরি বলে নেচে যায়।
যায়রে কাঁচা সোণার বরণ চাঁদের কিরণ মাখা তায়॥
শিরে চূড়া শিখি-পাখা, রাধা নাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা,
নয়ন বাঁকা ভঙ্গী বাঁকা, বাঁকা নূপুর রাঙ্গা পায়॥ ১॥
সে তো নয় দেখেছি যারে, বিমল যমুনার তীরে,
সেতো এম্‌নি করে বাঁশী ধ'রে মজাইত গোপিকায়॥২॥

বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য রোদন করাটা দুর্ব্বলতা নহে, উহা প্রেমময়ের অগাধ প্রেমের পরিচয়। তাই আদর্শপতি প্রভু আমার যাওয়ার বেলা পত্নীকে লক্ষ্য করিয়া প্রেমগদ্‌গদকণ্ঠে কহিলেন—"অখিল জীবের দুঃখে"—এই কথা বলিয়া প্রভু গৃহত্যাগ করিয়া সিংহবিক্রমে চলিতে লাগিলেন। দুই বাহু উর্দ্ধে তুলিয়া হরি হরি বলিয়া নাচিতে নাচিতে ভূতাবিষ্টের ন্যায় প্রভু আজ চলিয়াছেন, গন্তব্যস্থান—কাঞ্চননগর বা কণ্টকনগর (বর্ত্তমান কাটোয়া)। প্রভু নদীয়ার ঘাটে নদী পার হইলেন না, পাছে নদীয়ার লোক টের পায়, সুরধুনীর তীর ধরিয়া নাচিয়া চলিলেন, ইচ্ছা কণ্টকনগরীর পরপারে পৌছিয়া গঙ্গা পার হইবেন।

॥ ১॥ পদকর্ত্তা ভঙ্গী করিয়া বলিতেছেন—"সেই যে শিরে চূড়া শিখিপাখা, রাধানাম সর্ব্বাঙ্গে লেখা, নয়ন বাঁকা, ভঙ্গী বাঁকা রাঙ্গা পায়ে বাঁকা নূপুর পরা শ্যাম সুন্দরকে দেখিয়াছি একি সেই?" ভঙ্গীটী তো ঠিকই রয়েছে, তেম্নি তালে তালে রাঙ্গা পাও চল্‌ছে—তেম্নিই তো আকর্ণবিশ্রান্ত বিশাল নয়নে বঙ্কিম কটাক্ষ, একি সেই?

॥ ২॥ পূর্ব্বোক্তভাবে সন্দেহের অবতারণা করিয়া পদকর্ত্তা আবার বলিতেছেন, "না, এতো সে নয়—শ্যামল কালিন্দীকূলে যাঁকে দেখেছি—এতো সে নয়, কেন না তাঁর বরণ ছিল কালো—এর বরণ যেন চাঁদের আলো—সুরতাং এ তো সে নয়।" পরক্ষণেই গৌরাঙ্গের জপনিরত

বিশ্বরূপ কহে ফুকারি, চিনি চিনি মনে করি,
তার বরণ কালো এর চাঁদের আলো, নয়ন দেখে চেনা যায় ॥৩

॥ বরাড়ী—একতালী

এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়া, কাঁদিয়া কাঁদিয়া,
শিরে হানে করাঘাত ॥

ঊর্দ্ধে উত্তোলিত দুই বাহুকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—"কিন্তু এও যে তেম্নি ক'রে দুই বাহু ঊর্দ্ধে বিস্তার করিয়া চলিয়াছে, সেও তো এম্নি ক'রে বাঁশী ধরে গোপিকাদের প্রাণ মজা'ত। এ কি সেই-ই ?"

॥ ৩ ॥ সর্ব্বশেষে পদকর্ত্তা বল্ছেন—"না সমস্ত সন্দেহ ঐ নয়ন দেখেই মিটে যায় গো! এযে রাধারাণীর মনচোর, মা যশোদার ননীচোর, ব্রজগোপীর বসন চোর—এবার প্রেয়সীর বরণ চুরি ক'রে সেই ব্রজেরই শঠচূড়ামণি আবার এসেছে।" রং বদল করেছে বটে, কিন্তু সেই চোরা আঁখির চোরাবাণটা ফেলে আস্তে পারে নাই বলেই ধরা পড়ে গিয়েছে।

এদিকে প্রভুর প্রস্থানের পর বিষ্ণুপ্রিয়া জাগিয়া উঠিলেন। জাগিয়াই দেখিলেন প্রভু নাই; যে বক্ষে গৌরগুণনিধিকে ধারণ করিয়া অকাতরে নিদ্রাসুখ ভোগ করিতেছিলেন, সেই বক্ষে জড় উপাধান মাত্র রয়েছে। চমকিত হইয়া চোখ মুছিয়া আবার চাহিয়া দেখিলেন, বাস্তবিক শয্যাতলে প্রভু নাই, ভাবিলেন হয় তো রসিক চূড়ামণি কৌতুক করিয়া শয্যা ছাড়িয়া গৃহকোণে লুকাইয়াছেন; এবং ইহা ভাবিয়া গৃহের চারিকোণে বিস্ফারিতলোচনে চাহিয়া দেখিলেন কিন্তু সে গৌরনিধি যে কোণে থাকি-বেন, তাহাই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে; কিন্তু কই সব কোণই যে অন্ধকার!

কাটা গান্ধার—ধরা।

এ মোর প্রভুর, সোণার নূপুর,
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব ঝুরিয়া
জিতে না পারিব আর॥
মুঞি অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিনু প্রভুরে লৈয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়া, মোরে নিদ্রা দিয়া,
প্রভু গেল পলাইয়া॥
কাঞ্চন নগর, গেলা বিশ্বম্ভর,
জীব উদ্ধারিবার তরে।
এ দাস লোচন, দগ দগি মন,
শচী না পাইল দেখিবারে॥

হায়! হায়! তবে কি কপাল সত্য সত্যই পুড়িয়াছে! মহা অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া গাত্রোত্থান করিতেই দেবী দেখিলেন শয্যাতলে প্রভু আপন অঙ্গের আভরণ সকল ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া তখন আপন সর্ব্বনাশ সংঘটিত হইয়াছে বুঝিয়া প্রভুর আভরণ শিরে হানিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

॥ কেদার—একতালী ॥

শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের পাশে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।
শয়ন মন্দিরে ছিলা, নিশিভাগে কোথা গেলা,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি দুনয়নে,
শুনিয়া উঠিলা শচী মাতা।
আউদড় কেশে ধায়, বসন না রহে গায়
শুনিয়া বধূর মুখের কথা॥
তুরিতে জ্বালিয়া বাতি, দেখিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঞি উদ্দেশ না পাইয়া।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কাঁদিতে কাঁদিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়া॥
শুনিয়া নদীয়ার লোকে, কাঁদে উচ্চৈঃস্বরে শোকে,
যারে তারে পুছেন বারতা।
একজন পথে যায়, দশজন পুছে তায়,
গৌরাঙ্গ দেখ্যাছ যাইতে কোথা॥

কিয়ৎকাল অঝোরে কাঁদিয়া প্রভুর ঘরণী শচীমাতার মন্দির দ্বারে আসিয়া এই সর্ব্বনাশী বার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন।

আজ কলির জীবের জন্য স্বয়ং ভগবান্ কত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, তাহা প্রভুর জননী ও ঘরণীর এই দুর্দ্দশা দেখিয়া জীব বুঝিয়া লও। যিনি স্বয়ং ভগবান—ঐশ্বর্য্যের যাঁহার অবধি নাই, আজ সেই ভগবানের

যে বলে দেখ্যাছি পথে, কেহতো নাহিক সাথে,
কাঞ্চন নগর পথে ধায়।
কহে বাসু ঘোষ ভায়া, শচীর এমন দশা,
পাছে জানি মস্তক মুড়ায়॥

ভাটিয়ারী রাগ—একতালা।

ওগো তোমরা কি কেউ দেখেছ যেতে।
কাঁচা সোণার বরণ গৌর কিশোর নবীন সন্ন্যাসীর বেশে॥
সে যে ক্ষণে কাঁদে ক্ষণে হাসে,

জননী ও ঘরণী কাঙ্গালিনী সাজিয়া পথে বাহির হইয়াছেন—জীব তোমার দুষ্কৃতির জন্য। তাই জীব! আর ঘোড়দৌড় খেলাইওনা; যাও, ঐ নদীয়াধামে যাইয়া আমার প্রাণ গৌরাঙ্গের চরণ ধূলি গায়ে মাখিয়া গৌর গৌর বলিয়া কাঁদ—আমাদের কপট সন্ন্যাসী গৌরচাঁদকে আবার গৃহে ফিরাইয়া আন। শচীমার বুকের ধন, বিষ্ণুপ্রিয়ার হৃদয় রতনকে ফিরাইয়া দিয়া তোমাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত কর। পথে দাঁড়াইয়া শচীমা চীৎকার করিয়া কাঁদিতেছেন আর যে যায় তাহাকেই ডাকিয়া বলিতেছেন—

"তোমরা কি কেউ···।"

যখন শচীমাতা ও দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া শোকে উন্মত্তা হইয়া নদীয়ার পথে বাহির হইয়া কাঁদিতেছেন এমন সময় নিত্য নৈমিত্তিক রীতিমত নদীয়ার ভক্তগণ গঙ্গায় উষাবগাহন করিয়া গৌরবদন দর্শন করিতে আসিতেছেন:—

নদীয়ায় আজ শোকের বন্যা বহিয়া যাইতেছে—কে কারে প্রবোধ দেয়—সবাই কাঁদিয়া আকুল।

ক্ষণে নয়নজলে ভাসে ও তার পাগলের বেশ ;
নগরবাসী বল্‌গো তোরা আমার নিমাইচাঁদ কোন
পথে গেছে ॥

সে যে দুধের শিশু নবীন বয়েস,
নবনী-কোমল অঙ্গ মাথায় চাঁচর কেশ ;
হরি ব'লে বাহু তুলে, গেল কোন্ দিকে সে নেচে নেচে।
সে যে মা বলিয়ে ডেকে গেল—আমি অভাগিনী ছিনু
ঘুমে মেতে ॥

॥ ভজন—দাশপাড়িয়া।

সকল মহান্ত মেলি, সকালে সিনান করি,
আইলা গৌরাঙ্গ দেখিবারে।
গৌরাঙ্গ গিয়াছে ছাড়ি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে ॥
কাঁদে সবে মিলি কাঁদে, প্রাণে ধৈর্য্য নাহি বাঁধে,
কেহো কারে প্রবোধিতে নারে।
গোরার শোকেতে আজ, নদীয়ায় মৃত্যু সাজ,
ডুবিল সব অমার আঁধারে ॥

এদিকে প্রভু বিশ্বম্ভর কণ্টকনগরীর পরপারে পৌছিয়া লম্ফ দিয়া গঙ্গায় পড়িলেন অমনি চারিদিক্ হইতে জলরাশি আসিয়া প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ছুটিয়া পড়িতে লাগিল, উজান ভাঁটি দুইদিক্ হইতে জল ফুলিয়া ফুলিয়া আসিতে আরম্ভ করিল কেননা তাহারা ভাবিল বুঝি আকাশ হইতে চাঁদ খসিয়া জলে পড়িয়াছে। প্রভু অনায়াসে সন্তরণ করিয়া গঙ্গাপার হইয়া কণ্টকনগরীর পথে চলিলেন, সিক্তবসন, সিক্তনয়ন, অশ্রুবর্ষণে

তুড়ী—তেওট।

এ কোন চাঁদের দেশের সোণার মানুষ
কি লাগি এ ধরায় এল।
সে কোন ধনীর ধনী আজ কাঙ্গালিনী
এমন পেয়ে নিধি হারাইল ॥

তুড়ী—ছুট্।

আঁখি জোড়া কামের ধনু, নবনী কোমল তনু,
মোরা দেখে পাগল হৈনু, না জানি কত নারী পাগল কৈল ॥
বরণ জিনি কোটী ভানু, বিজরী বেষ্টিত তনু,
(চাঁদ) মুখে মধুর হাসি আধার নাশি দশদিশি আলো কৈল ॥

নয়ন রাঙ্গা হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। রুক্ষ কর্দ্দমাক্ত কেশ, শূন্যদৃষ্টি দেখিয়া, কণ্টকনগরীর নাগরীগণ যাঁহারা গাগরী কক্ষে লইয়া সুরধূনী-বারি আনিতে চলিয়াছেন—তাঁহারা পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন—"এ কে? এমন সুন্দর নবীন যুবা—অথচ পাগলের প্রায় রুক্ষকেশ, অঝোর নয়নে কেঁদে আকুল। সিক্তবসন, আবার ভূমিতে গড়াগড়ি যায়। কে এ?

কণ্টকনগর-নাগরীগণ সকলেই প্রাণগৌরাঙ্গের কৃপাপাত্র। তাই তাঁহারা কলসী রাখিয়া শ্রীগৌরাঙ্গের নিকটস্থ হইয়া নিমেষশূন্য নয়নে দেখিতে লাগিলেন সেই অপরূপ রূপ; যে রূপ দেখিলে নয়নবিহঙ্গ আপনা আপনি বাঁধা পড়িয়া যায়, তাঁহারা সেইরূপ দেখিয়া পাগল হইয়া উঠিলেন। তখন কৃষ্ণভাবিনী এক রমণী তাঁহাদিগের মধ্যে বলিয়া উঠিলেন—"ওলো আমার মনে হয় এ সেইই বটে। তবে এবার রং বদ্‌লে রঙ্গ কর্ত্তে এসেছে।" এ কথা শুনিয়া গৌরভাবিনী জনৈকা রমণী কহিলেন—"হাঁ গো হাঁ, এ সেইই বটে—সেই ব্রজের ননীচোরাই এবার ন'দেয় গোরা হ'য়ে এসেছে—এ সেইই বটে ॥

নয়নে করুণার বাদল, চরণ যুগল রাঙ্গা উৎপল,
দাস গোবিন্দ কেঁদে বিকল হেন চরণ না মিলিল ॥

ভাটিয়ারী—দাস পাঁড়িয়া ॥

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়া গৌর হয়েছে।
ওতো আগে গৌর ছিল না গো—
কার সঙ্গে অঙ্গ মিশায়ে রং ধরেছে।
কারে জানি বাসতো ভাল, সে ওর মনের মত ছিল
সদা ওর মন ছিল তার মনের কাছে,—
আজ তারে পায় না দেখা তাইতে একা
দেখার লাগি কাঁদ্‌তে আছে ॥
যায় যায় যায় যায় চলে যায়, চায় চায় চায় চায় ফিরে চায়
যেন কোন্ ভাবিনীর ভাবে মজে।
কারে জানি পাগল ক'রে এল ছেড়ে
তাই পাগল হ'য়ে ঋণ শোধিছে ॥
(দাস) গোবিন্দ কয় ও যারে চায়,
সে তো নাই এ ধূলোর ধরায়।
সে যে ওর হিয়ার মাঝে শু'য়ে আছে,
ও সেই ব্রজলীলার সাধ পুরাতে
দুই দেহেতে এক হয়েছে।

এই অপরূপ রূপের পুতুলই যে নদীয়ার গৌরাঙ্গসুন্দর এই কথা বলাবলি করিতেই গৌরভাবিনী জনৈকা রমণী কহিয়া উঠিলেন,—
"দেখ দেখ সখি…।"

কানাড়া—একতালা।

দেখ দেখ সখি! গোরা দ্বিজবর মণিয়া।
নিরূপম রূপ বিধি নিরমিল
কেমনে ধৈরজ ধরিয়া॥
আজানু-লম্বিত, সুবাহু যুগল,
বরণ কাঞ্চন জিনিয়া।
কিয়ে সে কেতকী, কনক অম্বুজ,
কিয়ে বা চম্পক মণিয়া।
কিয়ে গোরোচনা, কুঙ্কুম বরণ,
জিনি অঙ্গ ঝলমলিয়া।
মধুর বচনে, অমিয়া ঝরিখে,
ত্রিজগত মন ভুলিয়া॥
কত কোটী চাঁদ, বদন নিছনি,
নখচাঁদে পড়ে গলিয়া।
বাসু ঘোষে কহে গৌরাঙ্গ বদনে,
কে দেখি আসিবে চলিয়া॥

কণ্টকনগরী-নাগরীগণ এই ভাবে প্রভুতত্ত্ব আলোচনা করিতে করিতে প্রভু সমীপে উপনীত হইয়া প্রভুর পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে প্রভু আমার সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া "তোমরা সবে আমায় কৃপা কর যেন ব্রজের পথে যেতে পারি" এই বলিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া যে বটবৃক্ষতলে কেশবভারতী বসিয়াছিলেন তথায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন ও সন্ন্যাসমন্ত্র কামনা করিলেন। এদিকে নিত্যানন্দ, চন্দ্রশেখর, মুকুন্দ, গদাধর ও

ধানশী—একতালী।

তখন নাপিত আসি, প্রভুর সম্মুখে বসি
ক্ষুর দিল সে চাঁচর কেশে।
করি অতি উচ্চরব, কান্দে যত লোক সব,
নয়নের জলে দেহ ভাসে॥
হরি! হরি! কিনা হৈল কাঞ্চন নগরে।
যতেক নগরবাসী, দিবসে হইল নিশি,
প্রবেশিল শোকের সাগরে॥
মুণ্ডন করিতে কেশ, হয়্যা অতি প্রেমাবেশ
নাপিত কাঁদয়ে উচ্চরায়।
কি হৈল কি হৈল বলে, ক্ষুর আর নাহি চলে
প্রাণ ফাটি বিদরিয়া যায়॥

ব্রহ্মানন্দ ইঁহারা নবদ্বীপ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং প্রভুকে ফিরাইবার চেষ্টা বৃথা দেখিয়া প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণে সহায়তা করিতে লাগিলেন। আচার্য্য চন্দ্রশেখর প্রভুর প্রতিনিধি হইয়া সমস্ত ক্রিয়ার আয়োজন ও উদ্যাগ করিয়া দিলেন। ক্রমে এ সংবাদ কণ্টকনগরীতে পৌঁছিলে নগর হইতে দলে দলে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্ত্রীপুরুষ সকলে মিলিয়া কেশবভারতীর আশ্রমে বটবৃক্ষতলে আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন। সকলেই প্রভুকে এমন কোমল বয়সে সন্ন্যাসগ্রহণে নিষেধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু প্রভুর সংকল্প অটল দেখিয়া সকলে মিলিয়া হাহাকার করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য! কেন তাঁহারা কাঁদেন, কেহ জানেন না অথচ সকলেরই চোখে জল, শ্রীগৌরাঙ্গ সন্ন্যাস করিয়া যে নয়নজলের ভজন প্রচার করিবেন, আজ কাটোয়ার সন্ন্যাসগ্রহণদিনে

মহা উচ্চস্বর করি, কান্দে কুলবতী নারী,
সভাই সভার মুখ চায়্যা।
ধৈরয ধরিতে নারে, নয়নযুগল-নীরে,
ধারা বহে বয়ান বাহিয়া॥
দেখি কেশ অন্তর্দ্ধান, অন্তরে দগধ প্রাণ,
কাঁদিছেন অবধূত রায়।
রসিকানন্দের প্রাণ, সদা করে আনচান,
ফাটিয়া বাহির হইয়া যায়॥

তাহার একটু আভাষ দিতেই যেন অশ্রুর বন্যা বহাইয়া দিলেন; একা প্রভু অটল ও ধীর স্থির গম্ভীর হইয়া ভক্তগণকে ক্রিয়া সম্পাদন করিতে বলিতেছেন, কিন্তু আর সেখানে যতলোক সমবেত, সবাই কাঁদিয়া আকুল; বর্ষীয়ান্ পুরুষ ও বর্ষীয়সী মহিলাগণ প্রভুকে শতবার এ দুশ্চর ব্রত গ্রহণ করিতে নিষেধ করিতেছেন—আর দৈন্যের আধার প্রভু আমার করজোড়ে অতি স্নিগ্ধস্বরে বলিতেছেন—"আপনারা সকলে আমার পিতৃমাতৃতুল্য, আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার ব্রত ভঙ্গ না হয়, আমার প্রতি স্নেহ পরবশ হইয়া আমাকে নরকগামী করিবেন না।" প্রভুর দৈন্যে তাঁহারা অনুরোধ হইতে নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু কেহই প্রভুকে ফেলিয়া গৃহে যাইতে পারিলেন না! সাশ্রুলোচনে প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ক্রিয়া দর্শন করিতে লাগিলেন; আবশ্যক মত সন্ন্যাসের যাবতীয় উপকরণ আসিয়া জুটিয়া গেল; কেশবভারতী প্রভুকে মুণ্ডন করিয়া গঙ্গাবগাহন করিয়া আসিতে বলিলেন। নগরে ক্ষৌরকারকে আনিতে লোক পাঠান হইল। ক্ষৌরকার আসিলেন। প্রভুর মস্তক মুণ্ডন করিয়া বৈষ্ণব হরিদাস বিহ্বল হইয়া নাচিতে লাগিলেন—তাহার ক্ষৌরকার্য্য জীবনের মত শেষ হইয়া গেল।

কল্যাণী—একতালী।

মুড়াইয়া চাঁচর চুলে, স্নান করি গঙ্গাজলে,
বোলে দেহ অরুণ বসন।
গৌরাঙ্গের বচন, শুনিয়া ভকতগণ,
উচ্চস্বরে করয়ে রোদন॥
অরুণ দুইখানি ফালি, * ভারতী দিলেন তুলি
আর দিল একটী কৌপীন।
মস্তকে পরশ করি, পরিলেন গৌর হরি,
আপনাকে মানে অতি দীন॥
তোমরা বান্ধব মোর, এই আশীর্ব্বাদ কর,
নিজ কর দিয়া মোর মাথে।
করিলাম সন্ন্যাস, নহে যেন উপহাস,
ব্রজে যেন পাই ব্রজনাথে॥

* কাপড়ের টুক্‌রা, বস্ত্রখণ্ড।

অরুণ বসন পরিধান করিয়া, মুণ্ডিতমস্তক গৌরাঙ্গসুন্দর মূর্ত্তিমান্ যজ্ঞপুরুষের মত কেশবভারতীর আগে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া করজোড়ে অতি দীনভাবে বলিলেন—"হে গোসাঞি! আমায় ত্রাণ কর।" কেশবভারতী প্রভুর দৈন্যে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং কি মন্ত্রে প্রভুকে দীক্ষা দিবেন স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। ইহা দেখিয়া সর্ব্বশিক্ষাগুরু গৌরচন্দ্র ভারতীকে উদ্ধার করিবেন বলিয়া বলিলেন—"গোসাঞি! স্বপ্নে কোন মহাজন আমাকে এক মন্ত্ররাজ দান করিয়াছেন—দেখুন দেখি, এই মন্ত্রে আমার সন্ন্যাস হইতে পারে কিনা?"

এত কহি গৌর রায়, ঊর্দ্ধমুখ করি ধায়,
দিগবিদিগ নাহি মানে।
ভক্তজনার পাছে পাছে, লোটাঞা লোটাঞা কাঁদে
বাসু ঘোষ হা কাঁদ কাঁদনে॥

বেহাগ—দাস পাঁড়িয়া।

ছল ছল করে আঁখি করুণার জলে।
বিদায় সময়ে গোরাচাঁদে করে কোলে॥

এই বলিয়া প্রভু মন্ত্রগ্রহণের পূর্ব্বে ভারতীর কর্ণে সেই মন্ত্ররত্ন দান করত আপনি তাঁহাকে আত্মসাৎ করিলেন। ভারতী মন্ত্র শুনিয়া বলিলেন "হাঁ! এই মহামন্ত্রবর কৃষ্ণের প্রসাদে তোমার গোচর হইয়াছে।" এই কথা বলিয়া ভারতী আবার নীরব হইয়া রহিলেন। প্রভু অধীর হইয়া আবার বলিলেন—"গোসাঞি! আর আমায় যন্ত্রণা দিও না, আমায় উদ্ধার কর।"

তখন কেশবভারতী ভাবে গদগদ হইয়া প্রভুর কর্ণে পূর্ব্বাদিষ্ট মন্ত্র দান করিলেন এবং নাম চিন্তা করিতে করিতে শুদ্ধা সরস্বতী ভারতীর জিহ্বায় আসিয়া উচিত নাম লওয়াইয়া দিলেন এবং ভারতী উল্লাসে বলিয়া উঠিলেন—

"যত জগতের তুমি কৃষ্ণ বোলাইয়া।
করাইলা চৈতন্য কীর্ত্তন প্রকাশিয়া॥
এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
সর্ব্বলোক তোমা হৈতে যাতে হৈল্য ধন্য॥"
এই যদি ন্যাসিবর বলিলা বচন।
জয় ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন॥

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি আপনার সুখে।
করুণা কারণে পদব্রজে বুল লোকে ॥
গুরুভক্তি লওয়াবারে কর বিধিকর্ম্ম।
সংস্থাপন করিবারে সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম ॥
সর্ব্বলোক নিস্তারিতে করুণা প্রকাশ।
আমা বিড়ম্বিতে কৈলে এইত সন্ন্যাস ॥

(দক্ষিণা দান কর মোরে) (যা ক'রেছ বেশ করেছ)
(এই দক্ষিণা দেও হরি) (যেন পারের কড়ি লাগে না গো)
(মোরে দে'খে চি'নে পার করিও) (এই দক্ষিণা দিও মোরে)
(যেন পারের বেলা মনে থাকে)*

চতুর্দ্দিকে মহাহরিধ্বনি কোলাহল
করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণবসকল ॥

মন্ত্র ও সন্ন্যাসের নাম পাইয়া প্রভু গুরুকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিতে উদ্যত হইলে ভারতী গোসাঞি প্রভুকে দণ্ডগ্রহণ করিতে বলিলেন ও সেই রাত্রি তথায় যাপন করিতে আদেশ করিলেন।

* গুরুর আদেশে ভক্তগণসহ অবিরাম কীর্ত্তনানন্দে উক্ত রাত্রি তথায় অতিবাহন করিয়া প্রভাতে গুরুচরণে প্রণত হইয়া প্রভু বিদায় মাগিলে প্রভু অতি নিম্নস্বরে গম্ভীরভাবে "তথাস্তু" বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সেই মধুর শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে চলিলেন।

"এতাং স আস্থায় মুনীন্দ্রপদবীমধ্যাসিতাং পূর্ব্বতমৈ র্মহদ্ভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি-নিষেবয়ৈব ॥"

ইতি নিমাই সন্ন্যাস পালা সমাপ্ত।

গৌরাঙ্গ-বিদায়।

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ বিদায় ।

গান্ধার—কাটা ধরা।

আজ নদীয়া আঁধার কেন ?
আজ কি শোকের মেঘ ন'দের গগনে উঠিল রে,
(এমন উজল নদীয়া ধাম রে) (কোথায় গেল গোরাচাঁদ রে)
নদীয়া নাগরী, লইয়া গাগরী,
সুরধুনী তীরে চলে।
বহে অশ্রু ধার, দিঠি অন্ধকার
চলিতে চরণ টলে ॥
ঘাট মাঝে যাইয়া. কলসী রাখিয়া
উদাস নয়নে চাহে।
ছাড়ি দীর্ঘশ্বাসে, গদ গদ ভাষে
একে আন জনে কহে ॥

আজ নদীয়া অন্ধকারে মগ্ন। নদীয়ার চাঁদ, নদেবাসীগণের প্রাণ, শ্রীগৌরাঙ্গ চন্দ্র বিহনে আজ নদীয়া মলিন ও শোভাহীন। পূর্ব্বে শ্রীকৃষ্ণ-চন্দ্রের মথুরাপ্রয়াণে ব্রজের যে দশা হইয়াছিল, আজ গৌরাঙ্গ বিহনে নদীয়ারও সেই দশা। নদীয়ার সর্ব্বত্র আজ বিরহের ব্যথা, শোকের উচ্ছ্বাস ও দুঃখের রোদন। আবালবৃদ্ধবনিতা সকলের মুখেই সুধু এক কথা—গৌর নাই ! ধনীর ধন হারাইলে যে দুঃখ হয়, গৌরহারা নদীয়ায় আজ সেই দুঃখ। প্রভু আমার অনন্ত জীবের দুঃখে কাতর হইয়া সংসার

বিভাষ—তেওট্।

হরি হরি কিনা হৈল নদীয়া নগরে।
কেশব ভারতী আসি, বজর পাড়িল গো,
রসবতীর পরাণের ঘরে॥
গিরি পুরী ভারতী, আসিয়া করিল যতি,
আঁচলের রতন কাড়ি নিল।
প্রিয় সহচরী সঙ্গে, যে সাধ করিনু রঙ্গে
সে সব স্বপন সম ভেল॥
কিশোর বয়স বেশ, মাথায় চাঁচর কেশ,
মুখে হাসি আছে মিলাইয়া।
আমরা পরের নারী, পরাণ ধরিতে নারি
কেমনে বাঁচিবে বিষ্ণুপ্রিয়া॥

ছাড়িয়া বৈরাগী সাজিয়াছেন; কাঁথা করোয়া লইয়া সন্ন্যাসী হইয়া নদীয়ার উপর বিমুখ হইয়াছেন; নদীয়ানাগর চাঁচর চামর কেশ মুড়াইয়া কাঙ্গাল সাজিয়াছেন; আব তাঁর মদনমোহন বেশে ভুবনমোহন নৃত্য নদীয়ার লোক দেখিতে পাইবে না; তাঁর নয়নভুলান মধুররূপ দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে পাইবে না। সুধাসুমধুর স্নিগ্ধ হাস্য দেখিয়া প্রাণের সকল জ্বালা জুড়াইতে পাইবে না, এই দুঃখে, এই বঞ্চনার খেদে নদীয়ার লোক কাঁদিয়া আকুল! যাঁরা তাঁর নিজজন, তাঁরা তৃষিত নয়নে অতৃপ্তির পিপাসা লইয়া গৌরবদন দেখিবার আশায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিয়াছেন। প্রাণগৌরাঙ্গের প্রাণোন্মাদী সম্ভাষণ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইয়া আশাপথ চাহিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। সে মর্ম্মস্পর্শী সুধাস্বর একবার

সুরধুনী তীরে তরু, কদম্ব খণ্ডিতে চারু
প্রাণ কাঁদে কেতকী দেখিয়া।
নদীয়া আনন্দ ছিল, গোকুলের পারা হৈল
বাসু ঘোষ মরয়ে কাঁদিয়া॥

কল্যাণী—দোঠুকী।

আজ নদীয়া আঁধার কেন?

নদীয়া নগরে, আজি ঘরে ঘরে
বহয়ে তপত শ্বাসা।
গোরা অনুরাগে, বিহগ বিহগী,
কাঁদিয়া ছাড়িল বাসা॥
নদীয়া গগনে, শশী তারা সনে,
মেঘে মুখ ঢাকি কাঁদে।
নদীয়া নাগরী, না বাঁধে কবরী
ভুবনমোহন ছাঁদে॥

যে শুনিয়াছে, সে যে আর তাহা ভুলিতে পারে না; তাঁর প্রেমরস একবার যে পান করিয়াছে, সে যে আর তাহা ছাড়িয়া বাঁচিতে পারে না! তাই আজ নদীয়ার নরনারী পাগলের মত উদ্‌ভ্রান্তনয়নে হা গৌর! হা গৌর! বলিয়া ইতি উতি তাকাইতেছে এবং গৌরচাঁদের স্নিগ্ধ সুমধুর বাণী শুনিবার জন্য নদীয়াময় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নদীয়ার পুরাঙ্গনাগণ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুর্দ্দশা বর্ণনচ্ছলে আপনাদের প্রাণের ব্যথা করুণ ভাষায় প্রকাশ করিতেছেন। এমন কি গৌরচাঁদ নদীয়ায় থাকিতে যাহারা তাঁহার খোঁজও লয় নাই বরং তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, আজ তাহারাও গৌর গৌর বলিয়া মাথা কুটিয়া কাঁদিতেছে। তাঁহাদের

কুঞ্জ নগর, বাজার বন্দর
সকল আঁধার হেরি।
তরুলতা যত, শোকে উনমত,
হারাইয়া গৌর হরি ॥
সুরধুনী ধনী, হ'য়ে কাঙ্গালিনী,
সব ধৈরজ টুটি।
ফুলিয়া ফুলিয়া, তরঙ্গ তুলিয়া,
কাঁদে তীরে মাথা কুটি ॥
যত ভক্তকুল, কাঁদিয়া আকুল,
(শোকে) জননী গৃহিণী মরা।
গোবিন্দের হিয়া, না গেল ফাটিয়া,
কেমন পাষাণে গড়া ॥

যথারাগ—গড়্খেম্‌টা

শ্রীবাস অঙ্গনে, কাঁদে ভক্তগণে,
ভূমে দিয়া গড়াগড়ি।
এই না অঙ্গনে, নিতাইয়ের সনে,
নাচিত দয়াল হরি ॥

দুঃখ এই যে স্বকৃত কর্ম্মের ক্ষমা চাওয়ার সুযোগ আর হ'য়ে উঠ্‌ল না। “গৌরাঙ্গ জগতের জন্য কাঙ্গাল সাজ্‌লেন, আমাদের দুঃখে তিনি দুঃখী হ'য়ে জগতের উদ্ধারের জন্য সন্ন্যাসী সাজ্‌লেন, আমরা তাঁর সেবা করা দূরে থাকুক্ বরং তাঁর বিপক্ষতাচরণ করে এলাম। হায়! হায়! একদিন ক্ষমা চাওয়ার সুযোগও আর পেলাম না। আমাদের কি গতি হবে!

বিহাগড়া—গড়্‌খেম্‌টা।

গোরা গুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব।
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ॥
কে আর করিবে দয়া পতিত দেখিয়া।
দুর্লভ হরির নাম কে দিবে যাচিয়া ॥
অকিঞ্চন দেখি কেবা উঠিবে কাঁদিয়া।
গোরা বিনু শূন্য হৈল সকল নদীয়া ॥
বাসুদেব ঘোষ কাঁদে গুণ সোঙরিয়া।
কেমনে রহিবে প্রাণ গোরা না দেখিয়া ॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের স্বরূপ "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"—সুতরাং গৌরাঙ্গরসরাজের যে লীলা তাহাতেও পঞ্চরসের ফোঁড়ন আছে। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই যে রসপর্য্যায় ইহা বৃন্দাবনলীলায়ও যেমন নদীয়ালীলায়ও ভক্তদ্বারে ভগবান্ তেমনি আস্বাদন করিয়াছেন; প্রভু শচীমায়ের কাছে আদরের দুলাল বাৎসল্যের গোপাল, বিষ্ণুপ্রিয়াবল্লভ বিষ্ণুপ্রিয়ার নিকট পরমকান্ত, নদীয়া নাগরী নরহরির নিকট গৌর রসিকশেখর লম্পট নাগর, প্রাণগৌরের প্রাণ গদাধরের নিকট গৌর একাধারে নাগর ও সখা; রায় রামানন্দ ও স্বরূপ দামোদরের নর্ম্মসখ্য, দ্বাদশ গোপালের সখ্য, মুরারির দাস্য, শ্রীবাস ও হরিদাস প্রমুখ ভক্তগণের শান্ত ভাব; গৌরলীলা সাগরে পঞ্চরসের তরঙ্গ উঠিয়াছে; কেননা সেই যে পরম নাগর কৃষ্ণ তিনিই যে গৌরাঙ্গ হইয়া আসিয়াছেন; সুতরাং লীলার মাধুর্য্য বাড়িবে বই কমিবে কেন?

যাহাই হউক্, আজ গৌরহারা নদীয়ায় সেই পঞ্চরসেরই সাগরে

গান্ধার রাগ—একতালী।

আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
অলকা তিলকা কাচ।
আর না হেরিব, সোণার কমলে,
নয়ন খঞ্জন নাচ॥
আর না নাচিব শ্রীবাস অঙ্গনে,
ভকত চাতক লয়্যা।
আর না নাচিব' আপনার ঘরে,
আর না দেখিব চায়্যা॥
আর কি দুভাই, নিমাই নিতাই,
নাচিবেন একু ঠাঞি।
নিমাই করিয়া, ফুকারি সদাই
নিমাই কোথায় নাই॥
নিদয় কেশব ভারতী আসিয়া
মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি কেমনে,
রহিব নদীয়া মাঝ॥
কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
আমার গৌরাঙ্গ রায়।
শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিতে,
সংবরী গড়াগড়ি যায়॥

শোকের ঝঞ্ঝায় যে উদ্বেল তরঙ্গ উঠিয়াছে, সেই সকল তরঙ্গের উচ্ছ্বাস একে একে গীত হইতেছে।

বরাড়ী—একতালী

শ্রীবাসের উচ্চ রায় পাষাণ মিলাঞা যায়,
গদাধর না জীয়ে পরাণে।
বহিছে তপত ধারা যেন মন্দাকিনী পারা,
মুকুন্দের ও দুই নয়ানে॥
সকল মহান্ত ঘরে, বিধাতা বুঝাই ফিরে,
তবু স্থির নাহি হয় কেহ।
জ্বলন্ত অনল হেন, রমণী ছাড়িল কেন,
কি লাগি তেজিল তার লেহ॥
কি কব দুঃখের কথা, কহিব মরম ব্যথা,
না দেখি বিদরে মোর হিয়া।
দিবানিশি নাহি জানি, বিরহে আকুল প্রাণী,
বাসু ঘোষে পড়ে মুরছিয়া॥

ভগবান্ মধুর, ভগবান্ সুন্দর, ভগবান্ আনন্দময় ও প্রেমময়; ভগবানের প্রেমকণা লাভ করাই জীবের চরম পুরুষার্থ, ইহাই ভাগবতধর্ম্মের পরম শিক্ষা। আমাদের প্রাণ গৌরাঙ্গ সেই আনন্দবিগ্রহ, প্রেমসিন্ধু এবং অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য-মণ্ডিত লীলাপুরুষোত্তম, তাঁহার জগন্মোহন রূপের আগে বিশ্বের সকল সৌন্দর্য্য ম্লান হইয়া যায়। প্রভু এবার আনন্দের ভজন ও ভাগবতধর্ম্ম প্রচার করিতেই অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাই এবার তাঁহার লীলায় সুধু করুণার বাদল, সুধু প্রেমের বন্যা, সুধু আনন্দের হিল্লোল। প্রভু এবার আপনার প্রেমময় স্বরূপ দেখাইবার জন্যই জগতে সকলের সঙ্গেই আসিয়া প্রকট লীলায়ও সম্বন্ধ পাতাইয়া বসিয়াছেন। ভগবান্ ভক্তবৎসল—এ কথা ভক্তপাশে বিদিত ছিল, কিন্তু সেই

কল্যাণ—একতালী।

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া।
তব ধরি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া॥

ভক্তবৎসলতা কত গভীর ও তাহার স্বরূপ কত মধুর—তাহা গৌরহরি আগমনের পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে কেহ বুঝিতে পারে নাই। গৌরাঙ্গসুন্দর নিজ লীলায় নিজ আচরণের দ্বারা আপন ভক্তবৎসলতার যে ছবি আঁকিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, জগতে তাহার তুলনা নাই। গৌরাঙ্গ-ভগবানের এক বিশেষ স্বরূপ তাঁহার এই ভক্তানুগ্রহ ও ভক্ত সঙ্গে আত্মীয়তা! যেমন বিরাট্ গৌরভগবান্ তেমনই বিরাট্, তেমনই মহান্ তাঁহার ভক্তবৃন্দ—তাঁহারাও "ব্রহ্মাণ্ড তারিতে শক্তি ধরে জনে জন।" কিন্তু এত শক্তিধর হইয়াও তাঁহারা শিশুর মত সরল, নারীর মত প্রেম-প্রবণ ও ভাববিহ্বল—তাঁহাদের সঙ্গে গৌরসুন্দরের মিলন ও বিচ্ছেদ এত মধুর, মনোরম ও কবিত্বময় যে উহা পৃথিবীর মধ্যে অতি বড় কাব্য সাহিত্যের উপাদান। তাই গৌরহারা হইয়া নদীয়ার শ্রীবাসাদি ভক্তগণ যে রোদন করিতেছেন সে রোদনের মাহাত্ম্য গৌরভক্ত ব্যতীত অপরের বোঝা সহজসাধ্য নহে। কিন্তু এই রোদন দেখিয়া যে গৌরকে চিনিতে পারিয়াছে সে চিনিয়াছে যে—

"গোরা করুণাসিন্ধু অবতার।"

ভগবান্ যে ভক্তের কত প্রিয় তাহা ভক্ত ব্যতীত অন্যে বুঝিতেই পারে না। তিনি প্রিয়—একমাত্র প্রিয়, তাহা না হইলে তাঁহাকে কে ভালবাসে? শ্রুতি বলিয়াছেন—"প্রিয় মুপাসীত" 'প্রিয়ে'র উপাসনা করিবে। কিন্তু সেই প্রিয় কে? এই প্রশ্নের উত্তরে শুকমুখভ্রষ্ট নিগমকল্পতরুর গলিত রসালয় ফল শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত সেবী মহাজনগণ বলিলেন,—সর্ব্বপ্রাণিবৃন্দের সর্ব্বাবস্থার, সর্ব্বকালের একমাত্র প্রিয় সেই—

দিবানিশি পিয়ে গোরানাম সুধাখানি।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী॥
বদন তুলিয়া কারু মুখ নাহি দেখে।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে॥

"বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারম্।
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্ত্তিঃ॥"

সেই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রই সকলের প্রিয়—কেননা তিনি সকল আত্মার আত্মস্বরূপ। সেই শ্রীকৃষ্ণই, ব্রজের খেলা শেষ করিয়া নদীয়াধামে লীলা করিতে আসিলেন। আসিয়া দেখাইলেন তিনি জীবের কেমন প্রিয়—আর জীব তাঁহার কেমন প্রিয়। সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্ব্বে ও পরে, নীলাচলে ভক্ত সম্মেলনে, ঠাকুর হরিদাসের মহানির্য্যাণে, প্রভু গদাধরের নিকট বিদায় গ্রহণে, রামানন্দ সহ সম্মেলনে, গোপাল ভট্টের শক্তি সঞ্চারে, রঘুনাথ দাসের অঙ্গীকরণে, কুষ্ঠীবিপ্রের কুষ্ঠ মোচনে, রূপসনাতনের গোস্বামীত্ব-দানে, স্বরূপের ভৎর্সনে, জগদানন্দের অভিমানে, নিত্যানন্দের তাড়নে, অদ্বৈতাচার্য্যের সেবায়, বাসুদেবের অনুগ্রহে—গৌরলীলাগ্রন্থের পত্রে পত্রে প্রভুর এই 'প্রিয়' স্বরূপ ও ভক্তানুগ্রহের করুণ কাহিনী পড়িয়া পড়িয়া অতি পাষাণ নয়ন ফাটিয়াও অশ্রুর উৎস ছোটে আর মনে হয় সেই মহাজনের বাণী—

"গাও গাও পুনঃ, গৌরাঙ্গের গুণ
সরল করিয়া মন।
এ তিন ভুবনে এ হেন দয়াল
না মিলয়ে একজন॥"

হেনমতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী।
গৌরাঙ্গ বিরহে কাঁদে দিবস রজনী॥
প্রবোধ করয়ে কেহ কহি তার কথা।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা॥

নদীয়ার ভক্তগণের দুর্দ্দশা বর্ণনা করিয়া পদকর্ত্তা প্রভুর ঘরণী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা বর্ণনা করিতেছেন! এখানে কান্তাভাবের বিরহবিধুর মধুর রস। গৌরলীলা মহাকাব্যে বিষ্ণুপ্রিয়া এক উপেক্ষিতা নায়িকা। তিনি যৌবন প্রভাতেই স্বামীসঙ্গবঞ্চিতা চিরবিরহিণী দুঃখিনী নারী। ভক্তের নিকট তাঁহার মূর্ত্তি অসহ্য দুঃখের জননী। ভক্তের এক সান্ত্বনা ছিল যে জীবনে বাঁচিয়া থাকিলে শ্রীশ্রীপ্রভুর চরণসমীপে পৌঁছিতে পারিলে প্রভু তেমনই আদর করিয়া কোলে তুলিয়া লইবেন—কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়ার সে আশাসূত্রটুকুও নাই—যে মুহূর্ত্তে প্রভু সন্ন্যাসী হইয়াছেন, সেই মুহূর্ত্তে এ জীবনের মত তাঁহাকে পতিভাবে পাওয়ার আশা শেষ হইয়া গিয়াছে। বিষ্ণুপ্রিয়ার সম্বল সুধু গৌরনাম, আর চোখের জল—প্রভু জগতের হিতের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছেন, আর আমাদের জননী বিষ্ণুপ্রিয়া জগতের জন্য যথাসর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছেন। বহুবল্লভ গৌরকান্তের আরও অনেক আছে, কিন্তু কাঙ্গালিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার আর কেউ নাই,—মা আমার হৃদয়ের মণিকোঠা আঁধার করিয়া মাণিক তুলিয়া জগতের হাতে বিলাইয়া দিয়াছেন। আপন হাতে বুক চিরিয়া প্রাণ বাহির করিয়া দিয়াছেন এবং ধরণীর মত ধৈর্য্যে, মহাশক্তির মহাবীর্য্যে সে দুঃখকে বহন করিতেছেন, মুখে কথাটী নাই; এমন নিঠুরালী করিয়া জীবনকে দুঃখের সাগরে ডুবাইয়া দিয়া যে পতি তাঁহার সকল সম্পদ্ দারিদ্র্যে পরিণত করিয়া দিয়া যাওয়ার বেলা কথাটী না কহিয়া ফেলিয়া

ভূপালী—একতালী।

সন্ন্যাসী হইয়া গেলা, পুনঃ যদি বাহুরিলা,
নাহি আইলা নদীয়া নগরে।
হৃদয়ে হৃদয়ে ধরি, নিজ পর এক করি,
চাঁদমুখ দেখিবার তরে ॥
হরি হরি গৌরাঙ্গ এমন কেন হৈলা।
সভারে সদয় হৈয়া, মুঞি নারীরে বধিয়া,
এ শোক সাগরে ভাসাইলা ॥
এ নব যৌবন কালে, মুড়াইয়া চাঁচর চুলে,
নাজানি সাধিলা কোন নিধি।
কি ছার পরাণ যে পশুবত পণ্ডিত সে
গৌরাঙ্গ সন্ন্যাসে দিল বিধি ॥
অক্রূর আছিল ভাল, রাজবলে লৈয়া গেল,
রাখিল সে মথুরা নগরী।
নিতি লোক আইসে যায়, তাহাতে সম্বাদ পায়,
ভারতী করিল দেশান্তরী ॥

গেলেন, তাঁহার উপর বিন্দুমাত্র অভিযোগ নাই—"প্রভুর যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক; জগৎ যাঁহার সেবা চায় আমি একা কেমন করিয়া তাঁহার সেবার অধিকার ভোগ করিয়া জগৎকে বঞ্চিত করিব।" বিষ্ণুপ্রিয়া এই সান্ত্বনায় নিজকে বুঝাইয়া রাখিলেন। যে জগৎ তাঁহাকে প্রাণপতির সাক্ষাৎ সেবাসুখে বঞ্চিত করিল, তাহার উপরও প্রভুঘরণীর বিন্দুমাত্র ক্রোধ নাই বরং এতদিন যে জগৎকে বঞ্চিত করিয়া নিজে প্রভুকে একা

এত বলি বিষ্ণুপ্রিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া,
ধরণীরে মাগয়ে বিদায়।
বাসুদেব ঘোষ কয়, মো সম পামর নয়,
তবু হিয়া বিদরে আমার ॥

ধানশী—একতালী।

কাঁন্দয়ে নিন্দুক সব করি হায় হায়।
এইবার নদীয়ায় আইলে ধরিব তার পায় ॥
না জানি মহিমা গুণ কহিয়াছি কত।
এইবার নাগালি পাইলে হব অনুগত ॥

সেবা করিয়াছেন সেই জন্য দুঃখ বোধ করিতেছেন আর আব্রহ্মস্তম্ব সকল জগতের হিত চিন্তায়. সকলের উদ্ধারণ চিন্তায় প্রভুকে ডাকিতেছেন —"হে প্রভো! যদি জগৎকে সেবা দেওয়ার জন্যই দুঃখিনীর বুকে এই দুঃখের শেল হানিয়া থাক, তবে যেন এ জগতে তোমার সেবা পাইতে কেউ বাকী থাকে না।" বিষ্ণুপ্রিয়ার এ প্রার্থনা একমাত্র বাঞ্ছাকল্পতরু ব্যতীত আর কেউ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু আজও যিনি শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-চন্দ্ররূপে বর্ত্তমান. নবদ্বীপে বিরাজমান সেই শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠাতে ভক্তজননীর প্রার্থনা জগদ্বাসীর কর্ণগোচর হইয়াছে।

বিষ্ণুপ্রিয়ার বিলাপ।

বহির্ম্মুখ নিন্দুকগণের উক্তি।

সংসারে সর্ব্বাপেক্ষা হতভাগ্য ও বঞ্চিত জীব নিন্দুকগণ, কেননা তাহারা নিজ স্বভাবের দোষে আপন হৃদয়কে অপরের কুৎসায় মলিন করিয়া তোলে; হয় তো তাহাদের হৃদয়ে শ্লাঘনীয় গুণ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু অপরের দোষ কীর্ত্তন ও দোষভাবনা করিতে করিতে তাহারা নিজ

দেশে দেশে কত জীব তরাইল শুনি।
চরণে ধরিলে দয়া করিবে আপনি॥
না বুঝিয়া কহিয়াছি কত কুবচন।
এইবার পাইলে তার লইব শরণ॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গী যত পারিষদগণ।
তাঁরা সব শুনিয়াছি পতিতপাবন॥
নিন্দুক পাষণ্ডী যত পাইল প্রকাশ।
কাঁদিতে কাঁদিতে কহে বৃন্দাবন দাস॥

মনোহরসাই পাহিড়া—বড়দাসপাঁড়িয়া।

সন্ন্যাস করিয়া প্রভু গুরু নমস্করি।
প্রেমাবেশে বিদায় হইলা গৌরহরি॥*

সুহই—একতালী

আরে মোর সোণার গৌরাঙ্গ নাগর।
প্রেমজলে তিতিল সোণার কলেবর॥

নিজ গুণ ও সৎপ্রবৃত্তিকে হারাইয়া ফেলে এবং নিন্দ্যব্যক্তির 'কু'টাকে অতর্কিতে অবলম্বন করিয়া ফেলে। ইহার উপর যাহারা নিন্দুক তাহারা অবশ্য পরশ্রীকাতরও বটে। পরশ্রীকাতরতার ফল চির-অশান্তি ও অন্তর্দ্দাহ। জগতে এমন কৃপার পাত্র আর কেহ নাই, কেননা নিজের সুখ ও শান্তি উপেক্ষা করিয়া অপরের সুখে অসুখী হইয়া যে জীবন কাটায় বাস্তবিক তাহার মত হতভাগ্য এ জগতে আর কে আছে?

* এদিকে তো শ্রীধাম নবদ্বীপের এই দশা; ওদিক কাটোয়াতে শ্রীপাদ কেশব ভারতীর আজ্ঞায় সেই রাত্রি নামাবেশে তথায় যাপন করিয়া পরদিন প্রভাতে গুরুকে প্রণাম করতঃ প্রভু কৃষ্ণ-প্রেমোল্লাসে

প্রেমের ভাই নিতাই ডাকে ফিরিয়া না চায়।
কটিতে করঙ্গ বান্ধে দিগ্ পথে চায়॥
নিতাই বলে যত যত পাতকী তরাইলে।
সে সব সফল হবে আমা উদ্ধারিলে॥

মাতিয়া বাহ্যশূন্যভাবে ক্ষণে গড়াগড়ি, ক্ষণে তুঙ্গ লম্ফ দিয়া ও ক্ষণে ধাইয়া চলিতে লাগিলেন। দিগ্বিদিক্ জ্ঞান নাই, কৃষ্ণপ্রেমে পাগল হইয়া ব্রজের পথে যাইবেন বলিয়া চলিয়াছেন, কিন্তু যে দিকে নয়ন যায় সেই পথে চলিয়াছেন। এদিকে রঙ্গিয়া নিতাইচাঁদ প্রভুকে শান্তিপুরে প্রভু অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে ভুলাইয়া লইয়া যাওয়ার জন্য শান্তিপুরের পথে প্রভুকে লইয়া চলিলেন। পথে গৌরাঙ্গসুন্দর আচার্য্য চন্দ্রশেখরকে বিদায় দিয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে পাঠাইয়া দিলেন—নিতাইচাঁদও ইঙ্গিতে তাঁহাকে বুঝাইয়া দিলেন—"আচার্য্য! আপনি ন'দেয় যেয়ে ভক্তগণকে ও মাতৃদেবীকে বলুন, তাঁহারা সকলে মিলে প্রাণগৌরকে আকর্ষণ কর্ত্তে থাকুন—এদিকে আমি প্রভুকে ভুলিয়ে শান্তিপুরে বুড়ো গোসাঞির গৃহে নিয়ে যাচ্ছি। আপনি গোসাঞিকে নৌকা ল'য়ে গঙ্গাতীরে অপেক্ষা কর্ত্তে বলবেন, প্রভুকে নিয়ে পৌঁছাবামাত্র যেন আমাদের পার ক'রে লন্।"

এই যে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের সংকল্প—ইহা কার্য্যে পরিণত করিতে তাঁহাকে ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, কিন্তু সে ছলনাতে স্বার্থ বা কামনার গন্ধ মাত্রও নাই বলিয়া এরূপ ছলনা দূষণীয় নহে; বিশেষতঃ শ্রীপাদ নিত্যানন্দ পাতকীভাবন, জীবপাবন, জীববন্ধু ও ভক্তসহায়, তাঁহার সকল কার্য্যই জীবের হিতের জন্য এবং গৌরভক্তের আনন্দবর্দ্ধনের জন্য, তাঁহার নিজের উদ্দেশ্যে তিনি কোনও কার্য্যই করিতেন না; সুতরাং কোন কর্ম্মেই তাঁহার কোন 'ফলাভিসন্ধি' বা 'কৈতব' ছিল না। তিনি অকৈতবে যাহা কিছু আচরণ করিতেন

বাসুদেব ঘোষ কহে মুঞি অভাগিয়া।
মোরে না ছাড়িহ দয়া পতিত দেখিয়া॥

বিহাগড়া—একতালী।

শান্তিপুর দেখাইয়া বলে ঐ বৃন্দাবন।
সুরধুনী দেখাইয়া বলে কর কালিন্দী দর্শন॥
তীরে এক বটবৃক্ষ দেখাইয়া বলে ঐ বংশীবট।
সেথায় বিহার করে শ্যাম সুন্দর নট॥

তাহা কেবল গৌরলীলার মাধুর্য্য বাড়াইবার জন্য ও ভক্তকুল তথা জীবকুলকে কৃতার্থ করিবার জন্য। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দরের সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাহাকে ছলনা করিয়া শান্তিপুরে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়ার যে সঙ্কল্প তাহারও মূলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দের এই মঙ্গল ইচ্ছা যে নদীয়া ও শান্তিপুরের ভক্তমণ্ডলী যাঁহারা প্রভুর অদর্শনে মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছেন তাঁহারা প্রভুকে দর্শন করিয়া সুস্থ হউন এবং সকলে মিলিয়া শচীমাকে লইয়া আসিয়া প্রভুকে গৌড়দেশে থাকিবার জন্য প্রার্থনা করুন। হয় তো তাহাতে প্রভু বিরহ-যন্ত্রণা হইতে আমাদিগকে রক্ষাও করিতে পারেন, গৌরচাঁদের অদর্শন যাতনা আর ভোগ করিতে নাও হইতে পারে। ইহাপেক্ষাও গূঢ় উদ্দেশ্য, নদীয়ার কিশোর গৌরাঙ্গ শ্রীকেশ মুণ্ডন করিয়া জগদ্গুরু সাজিয়া কতদূরে সরিয়া গিয়াছেন, নদীয়ার পতিত পাষণ্ডিদিগকে সেই দৃশ্য দেখাইয়া উদ্ধার করিবার জন্য ; আজ আর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নহেন—আজ তিনি জগদ্গুরু-নারায়ণ ও ত্রিকালের আচার্য্য শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যমহাপ্রভুরূপে আপন ঘরে অতিথি। এই উদ্ধারণ সংকল্প করিয়া কলিজীবত্রাতা নিতাইচাঁদ প্রভুকে ভুলাইয়া শান্তিপুরের পথে লইয়া চলিলেন।

সুহই—বড়দাসপাঁড়িয়া।

প্রেমাবেশে প্রভুরে রাখিয়া শান্তিপুরে।
নিত্যানন্দ প্রভু আইলা নদীয়া নগরে॥
ভাবিয়া শচীর দুঃখ নিত্যানন্দ রায়।
পথ মাঝে অবনীতে গড়াগড়ি যায়॥

তথাহি—"প্রভু কহে কতদূরে আছে বৃন্দাবন।
তেঁহো কহেন কর এই যমুনা দর্শন॥
এত বলি তাঁরে নিল গঙ্গা সন্নিধানে।
আবেশে প্রভুর হৈল গঙ্গায় যমুনা জ্ঞানে
অহো ভাগ্য যমুনার পাইল দরশন।
এত বলি যমুনারে করেন স্তবন॥

"এত বলি নমস্কারি কৈল গঙ্গাস্নান।
এক কৌপীন নাহি দ্বিতীয় পরিধান॥
হেনকালে আচার্য্য গোসাঞি নৌকাতে চড়িঞা
আইলা নূতন কৌপীন বহির্ব্বাস লঞা॥
আগে আসি রহিলা আচার্য্য নমস্কার করি।
আচার্য্য দেখি বলে গোসাঞি মনে সংশয় করি॥
তুমি অদ্বৈত গোসাঞি ইঁহা কেনে আইলা।
আমি বৃন্দাবনে তুমি কেমনে জানিলা॥
আচার্য্য কহে তুমি যাঁহা তাঁহা বৃন্দাবন।
মোর ভাগ্যে গঙ্গাতীরে তোমার আগমন॥

ক্ষণেকে সম্বরি নিতাই আইলেন ঘরে।
শুনি শচী ঠাকুরাণী আইলা বাহিরে॥

ভীমপলশ্রী—একতালা।

দাঁড়াইয়া মায়ের আগে ছাড়য়ে নিশ্বাস।
প্রাণ বিদরয়ে ভাইয়ের কহিতে সন্ন্যাস॥
সন্ন্যাস করিয়া গৌর আইলা শান্তিপুরে।
আমারে পাঠাঞা দিল তোমা লইবারে॥
শচী কাঁদে নিতাই কাঁদে নদীয়া নিবাসী।
সবারে ছাড়িয়া নিমাই হইলা সন্ন্যাসী॥

প্রভু কহে নিত্যানন্দ আমারে বঞ্চিলা।
গঙ্গাতীরে আনি মোরে যমুনা কহিলা॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিতামৃত মধ্যখণ্ড. ৩য় পরিচ্ছেদ।

আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে বিমনা দেখিয়া বলিলেন, "প্রভু! নিত্যানন্দের কথা মিথ্যা নহে, কেননা গঙ্গার একধার হ'য়ে যমুনাদেবী প্রবাহিতা; পশ্চিমে যমুনা এবং পূর্ব্বে গঙ্গার ধারা; সুতরাং তুমি পশ্চিম ধারে স্নান করে যমুনায়ই অবগাহন করেছ। তার পর তোমার ইচ্ছায়ই নিত্যানন্দ এ কাজ করেছেন; নৈলে হে দয়াময়! এই বৃদ্ধের দেহে বুঝি প্রাণ থাকৃত না।" এই বলিয়া প্রভুর চরণ ধরিয়া অদ্বৈত গোসাঞি বালকের মতন রোদন করিতে লাগিলেন এবং ভক্তাধীন গৌরভগবানের করুণাকোমল প্রাণ একেবারে গলাইয়া ফেলিলেন। ক্ষণকাল পরে আচার্য্য গোসাঞি দন্তে তৃণ ধরিয়া অতি দীনভাবে করজোড়ে বলিলেন—"প্রভু! তিনদিন প্রেমাবেশে কিছু মুখে লও নাই উপবাসী রয়েছ, আজ অধমের ঘরে ভিক্ষা গ্রহণ কর; এক মুষ্টি তণ্ডুল পাক করিয়েছি শ্রীপাদ

কহয়ে মুরারি গোরাচাঁদ না দেখিলে।
নিশ্চয় মরিব প্রবেশিব গঙ্গাজলে॥
লক্ষ লক্ষ লোক মিলি করে হরি ধ্বনি।
অদ্বৈত মন্দিরে আজ গোরা গুণমণি॥

নিত্যানন্দকে সঙ্গে ক'রে আজ একবার চল—আমার বহুদিনের আশা পূর্ণ হউক।" প্রভু নীরবে সম্মতিজ্ঞাপন করিলে আচার্য্য গোসাঞি প্রভুকে ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে নৌকায় উঠাইযা নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুকে অদ্বৈতাচার্য্য-গৃহে রাখিয়াই প্রভুর আদেশ পাইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপে শচীমাতাকে আনিতে স্বয়ং চলিয়া গেলেন।

নিত্যানন্দ সদানন্দময়, কিন্তু আজ তিনিও গৌরবিহীন নদীয়ায় হেঁটবদনে অবনত নয়নে বিমর্ষভাবে চলিয়াছেন; আজ নিতাইয়ের সে নৃত্য সে উল্লম্ফন নাই। মাকে যাইয়া কি বলিবেন, প্রভুর আদেশ শুধু মাকে আনিতে, কিন্তু দুঃখিনী বিষ্ণুপ্রিয়াকে রাখিয়া মা কেমন করিয়া আসিবেন এবং প্রভুর ঘরণীও যদি আসিতে প্রস্তুত হন তবে তাঁহাকে কি বলিয়া নিরস্ত করিবেন, নিতাই এই ভাবিয়া নিতান্ত জড়সড়ভাবে প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

যে প্রভুর গৃহ একদিন জ্ঞানের রাজধানী নবদ্বীপ নগরীর হৃদয়ের মত ছিল, নিত্যই তাহাতে আনন্দ কোলাহল, নিত্যই তাহাতে প্রাণের স্পন্দন, সদাসর্ব্বদা অধ্যাপক পড়ুয়া ও ভক্তমণ্ডলীর কিলিবিলি, আজ সেই গৃহ শূন্য ও নীরব এবং নগরোপকণ্ঠে থাকিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়ার তপঃপ্রভাবে তপোবনের ন্যায় পূতগাম্ভীর্য্যে পরিপূর্ণ। নাই সে নামের উচ্ছ্বাস, নাই সে ভক্তিগঙ্গার কলকলরোল, নাই সে তার্কিক পড়ুয়াগণের তর্ক কলরব, নাই সে ভাগবত সভার পুলকোচ্ছ্বাস! নিতাই বড় কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া মায়ের নিকট প্রভুর প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন।

ভাটিয়ারী—একতালী।

আজু নাহি রে আনন্দ কি ওর।
চির দিনে মাধব মন্দিরে মোর॥

অন্তঃপুরে বসিয়া অশ্রুমুখী বিষ্ণুপ্রিয়া প্রাণনাথের আদেশ উৎকর্ণ হইয়া শুনিতে লাগিলেন; কিন্তু কই প্রভু দয়াময়, অনন্ত জীবকুলের দুঃখে তাঁর প্রাণ কাঁদে, অভাগিনী বিষ্ণুপ্রিয়ার দুঃখের কথা কি তাঁর একবারও মনে হয় না। বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী আজ কাঙ্গালিনী হইয়া—একটী কথার কাঙ্গালিনী হইয়া রুদ্ধশ্বাসে প্রভুর আদেশ শুনিতে লাগিলেন এবং প্রতি মুহূর্ত্তে মনকে বুঝাইতে লাগিলেন এইবার, এইবার প্রভু তোঁর কথা বল্‌ছেন। কিন্তু যখন শেষ পর্য্যন্ত প্রভুর বার্ত্তায় বিষ্ণুপ্রিয়ার নাম পর্য্যন্তও উল্লেখ হইল না তখন মা আমার দুর্ব্বিষহ মনের বেদনা আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না; যাঁহার চরণে যথাসর্ব্বস্ব বিলাইয়া দিয়া, যাঁহার নাম একমাত্র সম্বল করিয়া আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া দেবী দিনাতিপাত করিতেছিলেন—সেই চিরদয়িত, চিরকান্ত প্রিয়তম স্বামী অভাগিনীর উদ্দেশ্যে একটী কথা পর্য্যন্ত বলেন নাই, পতিব্রতা নারীর পক্ষে এ অবহেলা ও অবজ্ঞার খেদ সহ্য করা একেবারেই দুঃসাধ্য. তাই আহতা কুররীর মত অব্যক্ত আর্ত্তনাদে দেবী কাঁদিতে লাগিলেন, শত উচ্ছ্বাসে দুনয়ন ভরিয়া অশ্রুর বন্যা বহিতে লাগিল। দুঃখিনী জননী—এই দুঃখিনী বালিকার দুঃখ বুঝিয়া নিতাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"নিতাই! শুধু কি আমাকেই নিমাই যেতে বলেছে?" নিতাই বলিলেন—"হ্যাঁ মা!" মা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন—সেবারেও এই জবাব পাইয়া সর্ব্বশেষে খুলিয়া বলিলেন—"হ্যাঁরে নিতাই! এই যে পরের মেয়েকে খুন ক'রে নিমাই রেখে গেছে তাকে না নিয়ে আমি যাবই বা কেমন ক'রে; আর তাকে নেওয়ার কোন আদেশই বা নিমাইয়ের নাই কেন?" নিতাই

কেদার—একতালী।

নিতাই করিয়া আগে, চলিলেন অনুরাগে,
আইলা সভাই শান্তিপুরে।
মুড়াইয়া মাথার কেশ. ধর্য্যাছে সন্ন্যাসীর বেশ,
দেখিয়া সভার প্রাণ ঝুরে॥

চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিন্তু পাগলা ঈশান সমস্ত অবগত হইয়া শচীমার নিকট আসিয়া বলিলেন—"দেখ আইমা! আমার মা বিষ্ণুপ্রিয়া কি ভেসে এসেছেন? তিনি কি তোমার ছেলের কেউ নন্ যে, ন'দে শান্তিপুরের সকল নরনারী প্রভুর দর্শন পেয়ে কৃতার্থ হ'চ্ছেন—আর আমার মার দর্শন কর্ব্বার অধিকারটুকু পর্য্যন্ত নাই। বেশ, নাই যদি থাকে তো তুমিও যেতে পারবে না, ও যেমন নিষ্ঠুর ওর সঙ্গে নিঠুরালীই কর্ত্তে হবে; আর যদি আমার মাকে একলাটী ফেলে রেখে তুমি যাও, তবে আমার মাকে নিয়ে আমার যে দিকে দু' চক্ষু যায় সেই দিকে চ'লে যাব। আর তোমার এ গৃহ আগ্‌লে ব'সে থাক্‌ব না; আর না হয় তো আমি আমার মাকে ল'য়ে এখনই শান্তিপুরে রওনা হব। তিনি বলেন নাই বলে কি হ'য়েছে, তাঁকে দর্শন কর্ব্বার অধিকার যদি সকলের থাকে তা হ'লে আমার মায়েরও আছে।" শচীমাতার প্রাণেও বিষ্ণুপ্রিয়ার এই উপেক্ষাটা বড় খোঁচা মারিতেছিল, এখন ভক্ত ঈশানের এই কথা শুনিয়া মা নিতাইকে বলিলেন—"নিতাই! তুমি আহারাদি ক'রে যা খুসী কর বাপ্, কিন্তু আমার কাঙ্গালিনী বধূকে ঘরে ফেলে আমি একলা যেয়ে নিমাই দর্শনের সুখভোগ কর্ত্তে পার্‌ব না।" ওদিকে শান্তিপুরে অদ্বৈতগৃহে মহামহোৎসব আরম্ভ হইয়াছে।

নিতাই শচীমাতার কথা শুনিয়া নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া আহারাদি সমাপন করিলেন। মা সম্মুখে বসিয়া মায়ের আদরে নিতাইকে পরিতোষপূর্ব্বক

কর যোড় করি আগে, দাঁড়াইয়া মায়ের আগে,
পড়িলেন দণ্ডবৎ হইয়া।
দুই হাত তুলি বুকে, চুম্ব দিলা চাঁদমুখে,
কাঁদে শচী গলায় ধরিয়া॥
ইহার লাগিয়া যত, পড়াইলাম ভাগবত,
এ কথা কহিব আমি কায়।
অনাথিনী করি মোরে, যাবে বাছা দেশান্তরে,
বিষ্ণুপ্রিয়ার কি হবে উপায়॥
এ ডোর কৌপীন পরি, কি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ঘরে ঘরে খাবে ভিক্ষা মাগি।
জীয়ন্ত থাকিতে মায়, ইহা নাহি সহা যায়,
কার বোলে হইলা বৈরাগী॥

ভোজন করাইলেন এবং নিতাইকে বিশ্রাম করিতে অবসর দিয়া অন্তঃপুরে গেলে জগৎকল্যাণময়ী দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া মাকে ভোজন করাইয়া স্থির, অকম্পিত ও দৃঢ়কণ্ঠে বলিলেন, "মা! তিনি যে আদেশ ক'রেছেন সে আদেশ যাহাতে প্রতিপালিত হয় তাহা দেখা আমার কর্ত্তব্য, কেননা আমি তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সুতরাং আমি না গেলেও তোমাকে একাই যেতে হ'বে। মা! তুমি প্রস্তুত হও এবং ঈশানকে শিবিকা আন্‌তে বল।" বিষ্ণুপ্রিয়া এমন দৃঢ়সংকল্পের সহিত এ কথা বলিলেন যে, শচীমাতা আর উহার প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না এবং ঈশানও বিস্ময়ে ও ভক্তিতে মূক হইয়া অতর্কিতে দেবীর আদেশ প্রতিপালন করিলেন। যথাসময়ে শিবিকা আসিয়া উপনীত হইল। শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার গলা ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া শিবিকায় উঠিলেন, কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়া বুকে

গৌরাঙ্গের বিরাগে, ধরণী বিদায় মাগে,
আর তাহে শচীর করুণা।
কহয়ে বল্লভ দাস, গোরা চাঁদের সন্ন্যাস
ত্রিজগতে রহিল ঘোষণা॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালী।

আচার্য্য মন্দিরে ভিক্ষা করিয়া চৈতন্য।
পতিত পাতকী দুঃখী করিলেন ধন্য॥
চন্দনে শোভিত অঙ্গ অরুণ বসন।
সংকীর্ত্তন মাঝে নাচে অদ্বৈত-জীবন॥
মুকুন্দ মাধবানন্দ গায় উচ্চস্বরে।
নিতাই চৈতন্য নাচে অদ্বৈত মন্দিরে॥
আচার্য্য গোঁসাই নাচে দিয়া করতালি।
চির দিনে মোর ঘরে গোরা বনমালী॥
কহয়ে নয়নানন্দ গদাধরের পাছে।
কিবা ছিল কিবা হৈল আর কিবা আছে॥

পাষাণ ধরিয়া ধীরভাবে শুষ্ক নয়নে মাকে বিদায় দিয়া গৃহের অভ্যন্তরে যাইয়া মাটীতে লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

এই যে 'উৎসব' অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে দিবারাত্রি হইতে লাগিল ইহারই নাম "মহোৎসব।" এই সময় হইতে 'মহোৎসব' শব্দ মহাপ্রভুর ভোগ-রাগাত্মক ভজনোৎসব অর্থে রূঢ়ত্ব লাভ করিয়াছে। তাই 'মহোৎসব' শব্দে অন্যপ্রকার মহৎ উৎসবকে না বুঝাইয়া কেবল গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ভজনোৎসবকেই বুঝাইয়া থাকে।

জয়জয়ন্তী—দোঠুকী।

ধর ধর ধর, ধররে নিতাই,
আমার গৌরাঙ্গ ধর।
আছাড় সময়ে, অনুজ বলিয়া,
বারেক করুণা কর॥
আচার্য্য গোঁসাই, দেখিহ নিমাই,
আমার আঁখির তারা।
না জানি কিখেণে, নাচিতে কি মেনে,
পরাণে হইবে হারা॥
শুনহ শ্রীবাস, করাাছে সন্ন্যাস,
ভূমিতলে গড়ি যায়।
সোণার বরণ, ননীর পুতলি,
কোথা না লাগয়ে গায়॥
শুন ভক্তগণ, রাখহ কীর্ত্তন,
অধিক হইল নিশা।
কহয়ে মুরারি, শুন গৌর হরি,
দেখহ মায়ের দশা॥

শ্রীশ্রীকীর্ত্তনমহোৎসবে মাতোয়ারা হইয়া প্রভু ভাবাবেশে তুঙ্গ নর্ত্তন আরম্ভ করিলে শচীমাতা ব্যাকুল হইয়া কহিতেছেন।

সেদিন মায়ের অনুরোধে শীঘ্র শীঘ্র কীর্ত্তন সমাপন করিয়া ভক্তগণ প্রভুসহ বিশ্রাম করিয়া রজনী অতিবাহিত করিলেন। তৎপর দিবস প্রভাতে পুনরায় প্রেমানন্দ সুরু হইল ও অপূর্ব্ব নামসংকীর্ত্তন ও উদ্দণ্ডনৃত্যে ভক্তগণ প্রভুসহ স্নানকেলি সমাপন করিয়া প্রভু ও শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে

মিশ্র বেহাগ—গড়খেমটা।

সকল ভকত ঠাঁঞি হইয়া বিদায়।
নীলাচল দেখিতে চলিল গৌর রায়॥
মায়ের চরণ বন্দি অনুমতি লৈয়া।
অদ্বৈত আচার্য্য ঠাঁঞি বিদায় হইয়া॥
চলিলা গৌরাঙ্গ পহুঁ বোল হরিবোল।
আচার্য্য মন্দিরে উঠে ক্রন্দনের রোল॥
গৌরাঙ্গ গৌরাঙ্গ বলি কাঁদয়ে সভায়।
কাঁদয়ে নয়নানন্দ ধূলায় লোটায়॥

ভোজন করাইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং অপরাহ্নে প্রভু বিশ্রামান্তে ভক্তসঙ্গে মিলিত হইলে শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর ইঙ্গিতে মাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন। শ্রীশ্রীপ্রভু মায়ের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন—"মা! আমি তোমার মনে ব্যথা দিয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ ক'রেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পাচ্ছি যে তোমার খোলা হুকুম নিয়ে কাজ না কর্লে আমার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হবে না—অতএব মা। আমি সন্ন্যাসী, তোমার ব্রতধারী সন্তান। এখন তোমার চরণে আমার এই নিবেদন যে এখন তুমি আমাকে আদেশ কর আমি সন্ন্যাসীরূপে কোথায় বাস কর্‌ব। কেননা, এই নদীয়া ও শান্তিপুরের ভক্তগণ সকলেই তোমার আদেশ শিরোধার্য্য ক'রে আমাকে বিদায় দিবে এবং তোমার আদেশ ও ভক্তগণের নিকট বিদায় না ল'য়ে আমি যেথায়ই যাইনা কিছুতেই টি*কৃতে পার্‌ব না—তাই মা! মুক্তকণ্ঠে আমায় বিদায় দাও এবং বল কোথায় আমি এখন থাক্‌ব।" নিতাইপ্রমুখ অনুরাগী ভক্তগণ সোৎসুকনয়নে মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন এবং মনে মনে ভাবিলেন, একে তো মাতা

ধানশ্রী—একতালী।

পঁহু মোর অদ্বৈত মন্দির ছাড়ি চলে।
শিরে দিয়া দুটি হাত, কাঁদে শান্তিপুর নাথ,
কিবা ছিল কিবা হৈল ব'লে॥
কৃপা করি মোর ঘরে, অবধূত বিশ্বম্ভরে
কতরূপে করিলা বিহার।
এবে সেই দুই ভাই, কি দোষে ছাড়িয়া যাই,
শান্তিপুর করিয়া আঁধার॥
অদ্বৈত ঘরণী কাঁদে, কেশ পাশ নাহি বাঁধে,
প্রভু বলি ডাকে উচ্চস্বরে।
নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, প্রেম সংকীর্ত্তন রঙ্গে
কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥

বাৎসল্যময়ী, তাতে বৃদ্ধা—পতিহীনা, সুতরাং যদি তিনি প্রভুকে এই শান্তিপুরেই থাকিয়া যাইতে আদেশ করেন তো আমাদের আনন্দের আর সীমা থাকিবে না—মাও যখন ইচ্ছা প্রভুকে দর্শন করিতে পারিবেন। কিন্তু প্রভুর জননী শচীরাণী কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন,—"বাপ, নিমাই! আমার মতে তোমার নীলাচলধামে বাস করাই উচিত। কেননা শান্তিপুর বা নবদ্বীপ যেথানেই থাক সেথানেই তোমার সন্ন্যাসের উদ্দেশ্যে বিঘ্ন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর নিজগ্রামে থাকিতে নাই। এখানে থাকিলে আমার দগ্ধ প্রাণ শীতল হইতে পারে কিন্তু আমার সুখের জন্য আমার নিমাইয়ের নিন্দা আমি প্রাণ গেলেও শুন্‌তে পারব না, আমার আরও দুঃখ হউক্ তাতে আমার ভয় নাই। কিন্তু আমার নিমাইর যেন ধর্ম্মহানি হয় না। তারপর ভক্তগণের দুঃখ সে তো আছেই,

শান্তিপুর বাসী যত, তারা কাঁদে অবিরত,
লোটাঞা লোটাঞা ভূমিতলে।
শচীর নন্দন ভণ, শান্তিপুর হৈল যেন
পূরবে যে শুনিনু গোকুলে॥

-সোমতাল।

গৌরাঙ্গ বিদায় হইয়া নীলাচলে গেল।
ভক্তগণ সবে মিলি গৌর হরি বল॥

কিন্তু তাঁদেরও তো কর্ত্তব্য যে আমার নিমাইকে ধর্ম্মসাধনে তাঁরা সহায়তা করেন। বিশেষতঃ নীলাচলে যদি নিমাই থাকে তো ভক্তগণ দারুব্রহ্ম দর্শনের সুযোগে নিমাইর সঙ্গে মিলিতে পারিবেন এবং আমিও নীলাচলাগত ভক্তমুখে নিমাইর বার্ত্তা পাইব এবং কখনও বা গঙ্গাস্নান উপলক্ষে নিমাইও এখানে আসিতে পারিবে।"

মায়ের মুখে এই কথা শুনিয়া ভক্তগণ ধন্য ধন্য করিয়া উঠিলেন এবং প্রভু "তথাস্তু" বলিয়া মাতৃ-আজ্ঞা শিরে ধারণ করিলেন।

ইতি—শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গবিদায় পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর সহিত

নীলাচলে ভক্ত-সম্মেলন ।

অথ বন্দনা

ধানশ্রী—বড় দশকুশী।

কুন্দন কনক, কমল-রুচি-নিন্দিত,
সুরধুনী-তীর-বিহারী।
কুঞ্চিত কণ্ঠ, কলিত-কুসুমাকুল,
কুলকামিনী মনোহারী॥
জয় জয় জগজীবন যশোধীর।
জাহ্নবী সমুদ্র যেন, জলধর বরিষণ
ঐছে নয়ানে বহে নীর॥
পদুমিনী পুরুষ, পীরিতি পুলকায়িত,
পরিজন প্রেম পসারি।
পহিরণ পীত, পট পতিতাঞ্চল,
পদপঙ্কজ পরচারী॥

শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর গৌড়দেশ পরিত্যাগ করিয়া গৌড়ীয় ভক্তগণের নিত্যধ্যানের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছেন সুতরাং গৌরাঙ্গবিদায়ের পর ভক্তগণ অহর্নিশি গৌররূপসাগরে ডুবিয়া থাকিতেই ভালবাসিতেন তাই এই লীলার মঙ্গলাচরণে গৌররূপ গীত হইতেছে। ইহার সঙ্গে ভক্তগণ শ্রীলশ্রীরূপগোস্বামীপাদ প্রণীত 'শ্রীচৈতন্যাষ্টক' মিলাইয়া গৌর-ভগবানের রূপসুধা ও লীলামাধুরী আস্বাদন করুন। নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই ভগবান্ প্রকট হইয়া থাকেন—আবার প্রকট লীলায় তাঁহাকে হারাইলে সেই নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই তাঁহাকে পাইতে হয়, লীলাবাদের ইহাই পরম শিক্ষা।

রসবতী রমণী রঞ্জন রুচিরানন,
রতিপতি রঙ্গিত তায়।
রসিক-রসায়ন, রসময় ভাষণ,
রচয়তি শেখর রায়॥

ভাটীয়ারী—দাশপাঁড়িয়া।

নিতাই ধররে আমায়।
জীবকে হরিনাম বিলাতে যে তরঙ্গ উঠ্‌ল তাতে
সে তরঙ্গে আমি এখন ভাসিয়া বেড়াই।
(আমা হ'তে হ'লোনা রে) (নিতাই তুমি মোরে দয়া কর)
(জীবকে হরিনাম বিলাও)
মূর্খ নীচ পতিত দুঃখিত যত জন।
ভক্তি দিয়া কর গিয়া সবায় মোচন॥
আমিহ সন্ন্যাসী নিতাই তুমিহ সন্ন্যাসী।
কোথায় আদর্শ বল পাবে গৃহবাসী॥

জীবকে আদর্শ দেওয়ার জন্যই ভগবান্ মানুষের ভিতর মানুষ হইয়া আসেন। কিন্তু প্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর প্রভুর কৃপাপাত্র সকল মহাজনই গার্হস্থ্যাশ্রম ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী সাজিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া প্রভু নিতাইকে বলিলেন—"এ তো বাস্তবিক আমার উদ্দেশ্য নহে। জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ প্রেম, উহা লাভ করাই জীবের চরম প্রয়োজন। কিন্তু উহা লাভ করিতে গৃহী এবং সন্ন্যাসী উভয়ের সমান অধিকার এই তত্ত্ব প্রচার করাই আমার উদ্দেশ্য কিন্তু তাহা বুঝাইতে হইলে আমাকে আবার গৃহে ফিরিয়া যাইতে হইবে। কিন্তু ভাই!

সন্ন্যাস করিনু মোর ছন্ন হৈল মন।
কি কাজ সন্ন্যাসে মোর প্রেম প্রয়োজন॥
ইহা বুঝাইতে তুমি যাহ গৃহে ফিরে।
নাম চিন্তামণি দেহ ঘুরি ঘরে ঘরে॥

গৌরী—তেওট্।

চৈতন্য আদেশ পাইয়া, নিতাই বিদায় হৈয়া,
আইলেন শ্রীগৌড়মণ্ডলে।
সঙ্গে ভাই অভিরাম, গৌরীদাস গুণধাম,
কীর্ত্তন বিহার কুতূহলে॥
রামাই সুন্দরানন্দ, বাসু আদি ভক্তবৃন্দ,
সতত কীর্ত্তন রসে ভোলা।
পানিহাটি গ্রামে আসি, গঙ্গাতীরে পরকাশি,
রাঘব পণ্ডিত সহ মেলা॥
সকল ভকত লৈয়া, গৌর প্রেমে মত্ত হৈয়া,
বিহরয়ে নিত্যানন্দ রায়।
পতিত দুর্ম্মতি দেখি, হইয়া করুণ আঁখি,
প্রেমরত্ন জগতে বিলায়॥

আমার আর সে অবস্থা নাই। আর একমাত্র অবধূত ব্যতীত এ শক্তিও আর কাহারও নাই। সুতরাং তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও—যাইয়া গৌড়দেশ হরিনামরসে ডুবাও।”

প্রভু নিতাইকে বড় কঠিন আদেশ দিলেন; আজন্মমুক্ত অবধূত নিত্যানন্দকে গৃহে যাইয়া গৃহী সাজিতে হইবে—ইহাপেক্ষা গুরুতর কার্য্য

হরিনাম চিন্তামণি, দিয়া জীবে কৈল ধনী,
পাপ তাপ দুঃখ দূরে গেল।
পড়িয়া বিষয় ফাঁদে, না ভজি নিতাই চাঁদে,
প্রেমদাস বঞ্চিত হইল॥

শ্রীরাগ—একতালী।

নীলাচল পুরে গতায়াত করে,
যত বৈরাগী সন্ন্যাসী।
তাহা সভাকারে, কান্দিয়া সুধায়ে,
যত নবদ্বীপ-বাসী॥
তোমরা কি এক সন্ন্যাসী দেখ্যাছ।
শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য. যাহার নাম
তাহারে কি ভেটিয়াছ॥
বয়স নবীন, গলিত কাঞ্চন,
জিনি তনুখানি গোরা।
হরে কৃষ্ণ নাম. বলয়ে সঘনে,
নয়নে গলয়ে ধারা॥

নিতাই কল্পনাও করিতে পারিতেন না। কিন্তু প্রভুর আদেশ বলিয়া নিতাই তাহাও শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন। নিতাই উদ্ধারণ অবতার; শ্রীচৈতন্যের ভুবনপাবন লীলার ক্রিয়াশক্তিই নিত্যানন্দ, সুতরাং জীবের জন্য নিতাইচাঁদ না করিতে পারেন এমন কর্ম্মই নাই। তার উপর প্রভুর আজ্ঞা, সুতরাং নিরঙ্কুশ নিতাইচাঁদ লৌকিক ব্যবহার, সাম্প্রদায়িক বিধিনিষেধ সকল অগ্রাহ্য করিয়া গৌড়দেশে সংসার পাতিতে চলিলেন।

শ্রীধাম নবদ্বীপে গৌরাঙ্গবিরহে ভক্তগণের গৌরাঙ্গবিষয়ে অনুরাগ

কখন হাসন, কখন রোদন,
কখন আছাড় খায়।
পুলকের ছটা শিমুলের কাঁটা,
ঐছন সোণার গায় ॥

শঙ্করাভরণ—গড়খেমটা।

কত দিনে হেরব গোরাচাঁদের মুখ।
কবে মোর মনের মিটব সব দুঃখ ॥
কত দিনে গোরা পঁহু করবহি কোর।
কত দিনে সদয় হইবে বিধি মোর ॥
কত দিনে শ্রবণের হবে শুভদিন।
চাঁদ মুখের বচন শুনিব নিশিদিন ॥
বাসু ঘোষ কহে গোরাগুণ সোঙরিয়া।
ঝুরয়ে নদীয়ার লোক গোরা না দেখিয়া ॥

ও রতি বাড়িয়াই চলিয়াছে। গৌরাঙ্গচাঁদের দর্শন সুদুর্ল্লভ বলিয়া তাঁহার দর্শনে যাঁহারা ধন্য হইয়া আসিতেছেন তাঁহাদের দর্শন পাওয়ার জন্য আজ গৌড়ীয় ভক্তগণ আকুল। বিশুদ্ধাপ্রীতির ইহা অন্যতম লক্ষণ।

দয়িত ও বাঞ্ছিতকে লাভ করিয়া হারাইলে তাঁহাকে পুনরায় লাভ করিবার জন্য এমনই করিয়া লালসা জাগে। আনন্দের অনুভূতি একবার হইলে—সে আনন্দকে আবার পাইবার জন্য যে আকুল বাসনা জন্মে, প্রাপ্ত রত্ন হারাইয়া তাহার সন্ধান পাইলে তাহাকে পুনরায় আনিয়া কেমন করিয়া যত্ন করিব, আদর করিব, কোন্ মণিকোঠায় লুকাইয়া রাখিব, ইহার জন্য যেমন প্রতিমুহূর্ত্তে জল্পনা ও সংকল্প হইতে থাকে

কামোদমঙ্গল—দশকুশী।

তরুলতা যত, দেখে শত শত,
অকালে খসিছে পাতা।
রবির কিরণ, না হয় স্ফুরণ,
মেঘগণ দেখে রাতা॥
ডালে বসি পাখী, মুদি দুটী আঁখি,
ফল জল তেয়াগিয়া।
কাঁদয়ে ফুকারি, ডুকরি ডুকরি,
গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥
ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে,
কারো মুখে নাহি রা।
মাধবী দাসের, ঠাকুর নিতাই,
পড়িল আছাড়ি গা॥

আজ গৌরবিরহী জনেরও সেই দশা। প্রাণগৌরকে হারাইয়া নদীয়ার স্থাবরজঙ্গম, তরুলতা ও পশুপক্ষী ইত্যাদি সৃষ্টি চরাচর সকলেই আজ শোকে ম্রিয়মাণ। নিতাই শ্রীধাম নদীয়ায় পৌছিয়া তথাকার দৃশ্যে ব্যথিত হইয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। হায়! হায়! সোণার গৌরাঙ্গের সোণার নদীয়ার আজ কি দুর্দ্দশা! নিত্যানন্দপ্রভু শোকভারাক্রান্তহৃদয়ে নগরে ঘুরিয়া প্রভুর গৃহের দিকে চলিলেন, দেখিলেন সর্ব্বত্রই এক দশা; নদীয়া যেন চিরদিনের জন্য অমার আঁধারে ডুবিয়াছে। সর্ব্বত্রই দীর্ঘশ্বাস, সর্ব্বত্রই অশ্রুর উচ্ছ্বাস, সর্ব্বত্রই নিরুৎসাহ—কি যেন

কল্যাণী—দোঠুকী।

ক্ষণিক রহিয়া, চলিল উঠিয়া,
অবধূত নিত্যানন্দ।
প্রবেশি নগরে. দেখে ঘরে ঘরে,
লোক সব নিরানন্দ॥
না মেলে পসার, না করে আহার,
কারো মুখে নাহি হাসি॥
নগরে নাগরী. কাঁদয়ে গুমরি.
থাকয়ে বিরলে বসি॥
দেখিয়া নগর, ঠাকুরের ঘর,
প্রবেশ করল যাই।
আধমরা হেন, ভূমে অচেতন,
পড়িয়া আছেন আই॥
প্রভুর রমণী, সেই অনাথিনী,
প্রভুরে হইয়া হারা।
পড়িয়া আছেন, মলিন বসনে,
মুদল নয়ানে ধারা॥

গুরুভারে নদীয়ার মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে, তাই নদীয়ার আজ সব মৃতপ্রায়! শ্রীপাদ নিত্যানন্দ নগর ভ্রমণ করিয়া অতি কষ্টে অশ্রু সম্বরণ করিয়া প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন—কিন্তু তথায় শচীমাতা ও বধূ বিষ্ণুপ্রিয়ার দুর্দ্দশা দেখিয়া আর সাম্‌লাইতে পারিলেন না—উচ্চস্বরে রোদন করিয়া ভূমিতে আছাড় খাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

কয়ূথা ধানশ্রী —দাশপাঁড়িয়া ।

যেদিন হইতে গোরা ছাড়িল নদীয়া ।
তব ধরি আহার ছাড়িল বিষ্ণুপ্রিয়া ॥
দিবানিশি পিয়ে গোরা নাম সুধা খানি ।
কভু শচীর অবশেষে রাখয়ে পরাণী ॥
বদন তুলিয়া কারো মুখ নাহি দেখে ।
দুই এক সহচরী কভু কাছে থাকে ॥
হেন মতে নিবসয়ে প্রভুর ঘরণী ।
গৌরাঙ্গ বিরহে কাঁদে দিবস রজনী ॥
প্রবোধ করয়ে কেহ কহি তার কথা ।
প্রেমদাস হৃদয়ে রহিয়া গেল ব্যথা ॥

মায়ুর—তেওট্ ।

ভাবে দর দর বুক্ গৌরাঙ্গের চাঁদমুখ,
ভাবিতে শুইলা শচী মায় ।
কনক কমল জনু, গৌরসুন্দর তনু,
আচম্বিতে দরশন পায় ॥

দেবী বিষ্ণুপ্রিয়ার দশা বর্ণন ।

নিত্যানন্দ যাইয়া দেখিলেন আইমাতা গৌরাঙ্গচাঁদের বিরহে মৃতপ্রায় । এদিকে নিত্যানন্দ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই প্রভু মাতৃদেবীকে স্বপ্নযোগে দর্শন দিয়াছেন এবং মা আমার সাধ মিটাইয়া দেখিতে না দেখিতেই প্রভু অদৃশ্য হইয়াছেন । শচীমা আজ তাই শোকে উন্মাদিনীপ্রায়, এমন সময় নিত্যানন্দ প্রভু গৃহে প্রবেশ করিলেন। আইমাতা স্বপ্নে কি ভাবে দর্শন করিয়াছিলেন তাহাই গীত হইতেছে ।

মায়েরে দেখিয়া গোরা, অরুণ নয়নে ধারা,
চরণের ধূলি নিল শিরে।
সচকিতে উঠি মায়, ধাই কোলে করে তায়,
ঝর ঝর নয়ানের নীরে॥
দুহুঁ প্রেমে দুহুঁ কাঁদে, দুহুঁ থির নাহি বান্ধে
কহে মাতা গদ গদ ভাষা।
এতেক কহিতে কথা, জাগিলেন শচী মাতা,
আর নাহি দেখিবারে পায়।
ফুকারি কাঁদিয়া উঠে, ধারা বহে দুহুঁ দিঠে,
প্রেমদাস মরিয়া না যায়॥

সুহই—একতালী।

বিরহ বিকল মায়, সোয়াথ নাহিক পায়,
নিশি অবসানে নাহি ঘুমে।
ঘরেতে রহিতে নারি, আসি শ্রীবাসের বাড়ী,
আঁচল পাড়িয়া শুইলা ভূমে॥
গৌরাঙ্গ জাগয়ে মনে, নিদ্রা নাহি সব জনে,
মালিনী বাহির হৈয়া ঘরে।
সচকিতে আসি কাছে, দেখে শচী পড়ি আছে,
অমনি কাঁদিয়া হাতে ধরে॥
উথলি হিয়ার দুখ, মালিনীর ফাটে বুক
ফুকারি কাঁদয়ে উভরায়।
দুহুঁ দোঁহে ধরি গলে, পড়িল ধরণী তলে,
তখন শুনিয়া সভে ধায়॥

বিহাগড়া—একতালী।

সকল ভকতগণ শচী মায়ে দেখি।
সকরুণ হৈয়া কয় ছল ছল আঁখি॥
থির কর প্রাণ তুমি দেখিবে তাহারে।
নিত্যানন্দে পাঠাইল তোমা দেখিবারে॥
আমরা যাইব সভে নীলাচল-পুরী।
গঙ্গাস্নান করিয়া আনিব সঙ্গে করি॥
ঐছন বচন কহি প্রবোধ করিলা।
সভে মেলি থির করি ঘরে বসাইলা॥
প্রেমদাস কহে হেন নদীয়ার পীরিতি।
কি করি ছাড়িল গৌর না বুঝি কি রীতি॥

ভূপালী—একতালী।

নদীয়া নগরে গেলা নিত্যানন্দ রায়।
দণ্ডবৎ হৈয়া পড়ে শচী মাতার পায়॥
তারে কোলে করি কান্দয়ে করুণে।
নয়নের জলে ভিজে অঙ্গের বসনে॥
ফুকারি ফুকারি কাঁদে কাতর হিয়ায়।
গৌরাঙ্গের কথা কহি প্রবোধয়ে তায়॥
নিত্যানন্দ বলে মাতা থির কর মন।
কুশলে আছয়ে সুখে তোমার নন্দন॥
তোমারে দেখিতে মোরে পাঠাইয়া দিল।
তোর পদযুগে কত প্রণতি করিল॥

সুহই—কাটা দশকুশী।

কহ কহ অবধূত! আমার নিমাই কেমন আছে।
ক্ষুধার সময় জননী বলিয়া কারে কখন কি পুছে?
যে অঙ্গ কোমল, ননীর পুতুল,
আতপে মিলায় যে।
যতির নিয়মে নানা দেশ গ্রামে
কেমনে ভ্রময়ে সে॥
একতিল যারে, না দেখি মরিতাম,
বাড়ীর বাহির দূরে।
সে কেমনে মোরে, ছাড়িয়া আছয়ে,
কোথা নীলাচল পুরে॥
মুঞি অভাগিনী, আছি একাকিনী,
জীবনে মরণ-পারা।
কোথা বা যাইব, কারে কি কহিব,
প্রেমদাস জ্ঞানহারা॥

বেহাগ—তেওট্।

জননীরে প্রবোধ বচন কহি পুনঃ।
নিত্যানন্দ করে তার চরণ বন্দন॥
শ্রীবাসাদি সহচরে মিলিল নিতাই।
গৌরাঙ্গের কথা শুনি আকুল সভাই॥
মুরারি মুকুন্দ দত্ত পণ্ডিত রামাই।
একে একে সভা সনে মিলিলা নিতাই॥

সকল ভকত মেলি নিতাই লইয়া।
গোরা গুণ কথা শুনি স্থির করে হিয়া॥
প্রেমদাস বলে মুঁই কি বলিতে জানি।
গলায় গাঁথিয়া লই নিতাই চরণখানি॥

বরাড়ী—একতালী।

শচীমাতার আজ্ঞা পাঞা, সকল ভকত ধাঞা,
চলিলেন নীলাচল পুরে।
শ্রীনিবাস হরিদাস, অদ্বৈত আচার্য্য পাশ,
মিলয়া সকল সহচরে॥
অদ্বৈত নিতাই সঙ্গে, মিলিয়া কৌতুক রঙ্গে
নীলাচল পথে চলি যায়।
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, দেখিতে গৌরাঙ্গ চাঁদে,
অনুরাগে আকুল হিয়ায়॥

নিতাই কিছুদিন নদীয়ায় অবস্থান করিয়া মায়ের নিকট ভক্তগণসঙ্গে গৌরকথালাপে দিনযামিনী কাটাইলেন এবং মাকে প্রবোধ দিয়া রথযাত্রা উপলক্ষে গৌড়ীয় ভক্তগণসঙ্গে নীলাচলে প্রভুকে ভেটিবার জন্য যাইতে সংকল্প করিয়া মায়ের নিকট আদেশ প্রার্থনা করিলেন। শচীমাতা নিতাইকে কোলে লইয়া অজস্র অশ্রু বিসর্জ্জন করিলেন এবং যে যে জিনিষ নিমাই খাইতে ভালবাসিতেন তাহা স্বহস্তে প্রস্তুত করি নিতাইর হস্তে সমর্পণ করিয়া নিতাইকে যাইতে আজ্ঞা দিলেন।

ঝিঁঝিঁট—লোফা।

সর্ব্বপথে সংকীর্ত্তন আনন্দ করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে॥
উল্লাসে যে হরি ধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হয় ত্রিভুবন-জন॥
যে স্থানে রহেন আসি সভে বাসা করি।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ সকল।
সকল মঙ্গলে আইলেন নীলাচল॥
কমল পুরেতে ধ্বজ প্রাসাদ দেখিয়া।
পড়িলেন কাঁদি সবে দণ্ডবৎ হইয়া॥
প্রভু ত জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়।
আগু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাময়॥
অদ্বৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া॥

আজ শ্রীগৌরাঙ্গের গণ ভুবনপাবন মহাজন সকলে মিলিয়া যে পথে চলিয়াছেন সেই-সেই স্থান পবিত্র করিয়া যাইতেছেন। তাঁহারা সকলেই পরমভাগবত সুতরাং তাঁহাদের চরণস্পর্শে তীর্থস্থান আরও তীর্থীকৃত হইয়া থাকে—কেননা তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বদাই শ্রীহরি বিরাজমান আছেন। তথাহি শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতে—

"ভবদ্বিধা ভাগবতা স্তীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো!
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থিতা গদাভৃতা॥" ১।১৩।৮

তুড়ি গৌরীরাগ—দাসপাঁড়িয়া।

পথে দেবালয় গণ, করি কত দরশন,
উত্তরিলা আঠার নালাতে।
সকল ভকত সাথে, কীর্ত্তন করিয়া পথে,
যায় সভে গৌরাঙ্গ দেখিতে॥
কীর্ত্তনের মহারোল, ঘন ঘন হরিবোল,
অদ্বৈত নিতাই মাঝে নাচে।
গগনে উঠিল ধ্বনি, নীলাচলবাসী শুনি,
দেখিবারে ধায় আগে পাছে॥
শুনিয়া গৌরাঙ্গ হরি, স্বরূপাদি সঙ্গে করি,
পথে আসি দিলা দরশন।
মিলিলা সভার সঙ্গে, প্রেমে পরিপূর্ণ অঙ্গে,
প্রেমদাসের আনন্দিত মন॥

যথারাগ।

অদ্বৈত নিতাই সনে প্রভুর মিলন।
দোঁহে কাঁদে ধরি মহাপ্রভুর চরণ॥
কাঁদে মহাপ্রভু দুই প্রভু করি কোলে।
ভাসিল সকল অঙ্গ নয়নের জলে॥
শ্রীবাসেরে কোলে করি কাঁদেন গৌরাঙ্গ।
প্রেম জলে ভাসি গেল শ্রীবাসের অঙ্গ॥

এই যে গৌরভগবানের সঙ্গে ভক্তগণের সম্মেলন—জগতের ইতিহাসে ইহার তুলনা নাই; উহাতে যে কি আনন্দের তুফান উঠিত, কি অশ্রুর

মুরারি মুকুন্দ হরিদাস দামোদর।
একে একে মিলিলা সকল সহচর ॥
সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম প্রীত মনে॥
ভক্তনাথ ভক্তবশ ভক্তের জীবন।
ভক্ত গলা ধরি প্রভু করেন ক্রন্দন ॥
জগন্নাথ দেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ।
সহস্র সহস্র আইল মাল্য চন্দন॥
আজ্ঞা মালা দেখি হর্ষে শ্রীগৌর রায়।
অগ্রে দিলা শ্রীঅদ্বৈত সিংহের গলায়॥

বন্যা বহিয়া যাইত, তাহা যে প্রত্যক্ষ না করিয়াছে অথবা প্রত্যক্ষদর্শীর কৃপায় অনুভব না করিয়াছে তাহার বুঝিবার সাধ্যই নাই। গৌরলীলায় জগতে যে প্রেমের প্লাবন আসিয়াছিল তাহার সাধক শ্রীগৌরাঙ্গের অশ্রু। প্রভু আনন্দের ভজন প্রচার করিতে আসিয়া কাঁদিয়া গিয়াছেন এবং সে কান্নায় জীব প্রেমাশ্রুকে চিনিয়াছে এবং বুঝিয়াছে যে অতি দুঃখেই যে কেবল নয়ন গলিয়া ধারা বর্ষণ হয় তাহা নহে। অতি আনন্দেও তাহাই হয়—চরম দুঃখ ও চরম আনন্দের অভিব্যক্তি একই অশ্রুতে এবং চরম দুঃখ ও চরম আনন্দ স্বরূপতঃ একই পদার্থ। গৌরলীলায় জীব আরও বুঝিয়াছে যে, অতি কঠোর শাসন যেথায় ব্যর্থ হইয়া যায়—অতি কোমল অশ্রু সেথায় জয়লাভ করিতে পারে। তরল অশ্রু পাষাণ অপেক্ষাও কঠিন প্রাণকে গলাইয়া জল করিয়া দিতে পারে। তাই মধুর গৌরাঙ্গলীলায় অশ্রুর শাসন ব্যতীত অন্যরূপ শাসন নাই। যাহাকেই প্রভু কৃপা করিতেছেন—তাহারই গলা ধরিয়া প্রভু নয়ন-জলে তাহার

সর্ব্ব বৈষ্ণবেরে প্রভু শ্রীহস্তে আপনে।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায় চন্দনে॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্ব্ব ভক্তগণ।
বাহু তুলি উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন।
সভেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি।
জন্মে জন্মে যেন প্রভু তোমা না পাসরি॥
কি মানুষ পশু পাখী ঘরে জন্মি যথা।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্ব্বথা॥

তখন সকলে লইয়া জগন্নাথ দেখাইল।
গৌরাঙ্গ নিকটে সব মহান্ত রহিল॥

নবজীবনের শুভ অভিষেক করিয়া দিতেছেন আর সেই অশ্রুগঙ্গায় সেই ভাগ্যবান জীবের পুঞ্জীকৃত পাপমল ধৌত করিয়া তাহাকে কষিত কাঞ্চনের মত নির্ম্মল করিয়া তুলিতেছেন। সুধু তাহাই নহে; প্রভু সাশ্রু-লোচনে একবার যাহার দিকে চাহিতেছেন তাহারই অন্তর ভেদ করিয়া রোদনের উৎস ছুটাইয়া দিতেছেন। অতি বড় পাষণ্ডের নিকটও গৌরাঙ্গের অশ্রু বৃথা বিসর্জ্জন হয় নাই। আজ সেই গৌরাঙ্গ অভিন্নতত্ত্ব নিতাই ও অদ্বৈতাচার্য্যকে কোলে করিয়া কাঁদিতেছেন, করুণনয়নে এক একজন ভক্তের দিকে তাকাইতেছেন আর তাঁহাকে কাঁদাইয়া আকুল করিতেছেন। ভক্তগণের এই যে রোদন, ইহাতেই তাঁহারা ধন্য হইয়া যাইতেছেন; তারপর প্রাণগৌরাঙ্গ এক এক করিয়া যখন ভক্তগণকে আলিঙ্গন করিতেছেন তখন ভক্তগণ ভাবে অভিভূত হইয়া অঝোরে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেউ কথাটী বলিতে পারিতেছেন না।

প্রেমদানে পূরিল সভার অভিলাষ।
বঞ্চিত হইল সবে একা প্রেমদাস ॥

কেদার—একতালী।

মধুর মধুর গৌর কিশোর,
মধুর মধুর নাট।
মধুর মধুর সব সহচর,
মধুর মধুর হাট ॥
মধুর মধুর মৃদঙ্গ বাজত,
মধুর মধুর তান।
মধুর রসেতে মাতল ভকত
গাওত মধুর গান ॥

সকলেরই চোখে হু হু করিয়া অশ্রুর প্রবাহ ছুটিয়াছে। (আহা! সে রোদনে কি সুখ একদিনও যদি বুঝিতে পারিতাম! তেমনই করিয়া একদিনও যদি কাঁদিতে পারিতাম, ছার জীবন বুঝি চিরদিনের মত ধন্য হইয়া যাইত!)

কিয়ৎকাল সকলেই এইভাবে কাটাইলে প্রভু বড় আদর করিয়া সকলের কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন ও ভক্তগণও প্রভুর চরণে যথাবিহিত নিবেদন করিলেন।

কুশল জিজ্ঞাসা ও স্বাগতসম্ভাষণান্তে প্রভু, নিতাই অদ্বৈত ও অন্যান্য ভক্তগণকে লইয়া দারুব্রহ্ম দর্শন করাইলেন ও যথারীতি সকলকে বাসা ঠিক করিয়া দিয়া গম্ভীরায় গমন করিলেন।

মধুর হেলন, মধুর দোলন,
মধুর মধুর গতি।
মধুর মধুর বচন সুন্দর,
মধুর মধুর ভাতি॥
মধুর অধর জিনি শশধর,
মধুর মধুর হাস।
আরতি পীরিতি চরিত মধুর
মধুর মধুর ভাষ॥
মধুর যুগল নয়ন রাতুল,
মধুর ইঙ্গিতে চায়।
মধুর প্রেমের মধুর বাদর,
বঞ্চিত শেখর রায়॥

শ্রীশ্রীরাজা-গজপতি-প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার ।

শ্রীশ্রীরাজা গজপতি
প্রতাপরুদ্র উদ্ধার।

মঙ্গলাচরণ।

ধানশ্রী—জোতসোমতাল।

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব গোঁসাই।
পতিতপাবন তোমা বিনে কেহ নাই॥
কাহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায়॥
গঙ্গার পরশ হইলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর এই তোমার গুণ॥
হরিস্থানে অপরাধ তারে হরি নাম।
তোমা স্থানে অপরাধ নাহিক এড়ান॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন মম বৈষ্ণব পরাণ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
নরোত্তমে কর দয়া আপনার বলি॥

অথ পালারম্ভঃ

সুহইরাগ—একতালী।

আর দিন সার্ব্বভৌম কহে প্রভু স্থানে।
অভয় দান দেহ তবে করি নিবেদনে॥
প্রভু কহে কহ তুমি কিছু নাহি ভয়।
যোগ্য হইলে করিব অযোগ্য হইলে নয়॥
সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হইয়া তোমা মিলিবারে চায়॥

কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্য বচন॥
সন্ন্যাসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রীদরশন সম বিষের ভক্ষণ॥

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর নীলাচললীলার ঘটনাবলীর মধ্যে জীবোদ্ধারের দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাসুদেব সার্ব্বভৌমের প্রতি কৃপা ও তাঁহাকে উদ্ধার করা সর্ব্বপ্রধান ঘটনা। ঘোর অদ্বৈতবাদী, অদ্বিতীয় পণ্ডিত ও পাণ্ডিত্যের অভিমানে স্ফাত সার্ব্বভৌম মহাপ্রভুর কৃপায় এখন আদর্শ বৈষ্ণব, কৃষ্ণপ্রেমের মহাজন ও নিরভিমান ভক্ত। এখন আর তাঁহার 'আমি ব্রহ্ম' ভাব নাই, তিনি কায়মনোবাক্যে এখন কৃষ্ণদাস সাজিয়াছেন এবং সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, অত বড় তার্কিক পণ্ডিত সকল তর্ক, সকল সংশয় দূরে পরিহার করিয়া মানুষ গৌরাঙ্গকে ভগবান্ বলিয়া পূজা করিতেছেন। এই যে বৈষ্ণবতা ইহা লাভ করাতে সার্ব্বভৌমের ভিতর আর একটী ভাব স্বতঃই আসিয়া স্ফূর্ত্তিলাভ করিয়াছে যেটী প্রকৃতই ভাগবতের লক্ষণ, সেটী হইতেছে নির্ম্মৎসর ভাবে জগতের যাবতীয় জীবের উদ্ধারণের জন্য প্রবল কামনা ও চেষ্টা। গৌরলীলায় আমরা এই ভক্ততত্ত্বকে বিশেষভাবে পাইয়াছি এবং তাহাতে দেখিয়াছি যে গৌরভক্ত মাত্রেই উদ্ধারণ বা লোকতারণক্ষম এবং তাহাদের প্রত্যেকের সাধনার মধ্যে এই জীবহিতব্রত বা জীবোদ্ধারসংকল্প বর্ত্তমান। কেন এইরূপ হয় ইহা অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবের আনন্দের উপাসনাই ইহার মূল কারণ। যেই মানুষ গৌরাঙ্গের কৃপাবিন্দু পাইয়া বৈষ্ণব ভজনে ব্রতী হইলেন সেইদিন হইতে তাঁহার লক্ষ্যস্থল হইল "আনন্দ", কেননা "অখিলরসামৃতসিন্ধু" "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র আনন্দেরই মূর্ত্তবিগ্রহ। বৈষ্ণব যখনই এই আনন্দস্বরূপের আস্বাদ

ভূপালী—একতালী।

সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম॥
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে ইন্দ্রিয় বিকার॥
ঐছে বাত পুনরপি মুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে॥

পাইলেন অমনই সেই আনন্দ নিখিল জীবের ঘরে বিলাইয়া দেওয়ার জন্য পাগল হইয়া উঠিলেন,—যেহেতু আনন্দের স্বভাবই এই।

আনন্দ আধারবিশেষে সীমাবদ্ধ থাকিতে চায়না—বিস্তৃতি ও ব্যাপকতা তাহার ধর্ম্ম; সে চায় সুধু আপনাকে বিলাইতে, আপনাকে ছড়াইতে, প্রবাহ তুলিয়া জগৎ ডুবাইতে, তিলেকে ভুবন তল করিতে। লৌকিক জীবনেও আমরা নিয়ত ইহা দেখিতে পাই যে, যেই কেহ আনন্দ পায় অমনই তাহা দশজনকে বিলাইবার জন্য, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন ও প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া তাহা আস্বাদন করিবার জন্য তাহার একটা প্রবল চেষ্টা উপস্থিত হয়; একা একা আনন্দ উপভোগ করা যায় না। তাই প্রেমধর্ম্মের সাধক আনন্দব্রহ্মের উপাসক, প্রেমানন্দের অধিকারী বৈষ্ণবগণ জীবের দুঃখ দূর করিবার জন্য নিয়তই একটা প্রেরণা অনুভব করিয়া থাকেন। সে ভাবটী তাঁহাদের ক্ষণিক ভাব নহে এবং তাহা জোর করিয়া তাহাদের আনিতে হয় না উহা তাঁহাদের স্বরূপের অঙ্গীভূত। এই জন্যই মহাপ্রভুর ভাগবতধর্ম্মে "আনুগত্যের" স্থান বহু উর্দ্ধে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে অর্থাৎ যদি আনন্দবিগ্রহ শ্রীশ্রীশ্যামসুন্দরের লীলারস আস্বাদন করিতে চাও

বালাধানশী—ঝপতাল।

ভয় পাইয়া সার্ব্বভৌম নিজ ঘরে গেলা।
হেনকালে প্রতাপরুদ্র পুরুষোত্তমে আইলা॥
রামানন্দ রায় আইলা গজপতি সঙ্গে।
প্রথমেই প্রভুরে আসি মিলিলেন রঙ্গে॥
রায় প্রণতি কৈল প্রভু কৈল আলিঙ্গন।
দুইজনে প্রেমাবেশে করয়ে ক্রন্দন॥
রায় সনে প্রভুর দেখি স্নেহ ব্যবহার।
সব ভক্তগণ মনে হৈল চমৎকার॥
রায় কহে তোমার আজ্ঞায় রাজাকে কহিল।
তোমার ইচ্ছায় রাজা মোরে বিষয় ছাড়াইল॥
আমি কহিনু আমা হইতে না হয় বিষয়।
চৈতন্য চরণে রহোঁ যদি আজ্ঞা হয়॥
তোমার নাম শুনি রাজা আনন্দিত হৈলা।
আসন হৈতে উঠি মোরে আলিঙ্গন কৈলা॥

তবে সেই আনন্দের অধিকারী যে নির্ম্মৎসর বৈষ্ণব মহাজন তাঁহাদের চরণে শরণ লও। গৌরলীলায় যে উদ্ধারণলীলা……যথা জগাই মাধাই উদ্ধার, গোপাল চাপাল উদ্ধার, সার্ব্বভৌম উদ্ধার, প্রকাশানন্দ উদ্ধার ইত্যাদি ইহার সর্ব্বত্রই ভক্তকৃপাই ভগবৎকৃপার সেতু। প্রভু দেখাইয়াছেন যে, আনুগত্য ব্যতীত উদ্ধার হওয়া বহুদূরে। সমস্ত ভাগবতধর্ম্মের ইহাই মেরুদণ্ড। গৌরছাড়া গোবিন্দ বহুদূরে; গোপীছাড়া গোপীকান্ত সুদুর্ল্লভ, ভক্তছাড়া ভগবান্ পাওয়া সুদুষ্কর। আজ তাই ভক্ত সার্ব্বভৌম

তোমার নাম শুনি হৈল মহা প্রেমাবেশ।
মোর হাতে ধরি কহে পিরীতি বিশেষ॥
তোমার যে বর্ত্তন তুমি খাহ সে বর্ত্তন।
নিশ্চিন্ত হইয়া সেব প্রভুর চরণ॥
আমি ছার যোগ্য নহি তাঁর দরশনে।
তাঁরে যেই সেবে তাঁর সফল জীবনে॥
পরম কৃপালু তিঁহো ব্রজেন্দ্র-নন্দন।
কোন জন্মে অবশ্য মোরে দিবে দরশন॥
যে তার প্রেম আর্ত্তি দেখিল তোমাতে।
তার এক লেশ প্রীতি নাহিক আমাতে॥
প্রভু কহে তুমি কৃষ্ণভকতপ্রধান।
তোমারে যে প্রীতি করে সেই ভাগ্যবান॥

রাজা প্রতাপরুদ্রের উদ্ধার কামনা করিয়া প্রভুর চরণে নিবেদন করিতে আসিয়াছেন। যেই মুহূর্ত্তে সার্ব্বভৌমের হৃদয়ে রাজা প্রতাপরুদ্রের উদ্ধারের কামনা উদয় হইয়াছে, প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যাকাশেও গৌরচন্দ্রের কৃপাকিরণ অচিরেই উদ্ভাসিত হইবে বলিয়া প্রভু ও প্রভুভক্তগণ সকলেই সে কথা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছেন; কেবল প্রতাপ-রুদ্রের অনুরাগ বাড়াইবার জন্য ও তাঁহার কর্ম্ম খণ্ডন করিবার জন্য প্রভু 'বাম' ভাব অবলম্বন করিলেন। ভক্তসাধক! সমগ্র কৃষ্ণলীলা, মিলনরহস্য, দূতীতত্ত্ব, মঞ্জরীভাব ও মান, বিপ্রলম্ভ, রসোদ্গার ইত্যাদি যাবতীয় লীলারস এই গৌরলীলার ভিতর আনুগত্যের দ্বারে চিনিয়া লউন, বুঝিয়া লউন ও আস্বাদন করিয়া দেখুন; দেখুন! কৃষ্ণলীলার যাহা কিছু সকলই এখানে আমদানী হইয়াছে। প্রতাপরুদ্রের ভাগ্যাকাশে গৌরচন্দ্রের

তোমাকে এতেক প্রীতি হইল রাজার।
এই গুণে কৃষ্ণ তারে করিব অঙ্গীকার॥
পুরী ভারতী গোঁসাই স্বরূপ নিত্যানন্দ।
চারি গোসাঞির কৈল রায় চরণাভিবন্দ॥
জগদানন্দ মুকুন্দাদি যত ভক্তগণ।
যথাযোগ্য সব ভক্তে করিলা বন্দন॥
প্রভু কহে রায় দেখিলে কমল লোচন।
রায় কহে এবে যাই পাব দরশন॥
প্রভু কহে রায় তুমি কি কর্ম্ম করিলা।
ঈশ্বর না দেখি আগে এথা কেন আইলা॥
রায় কহে চরণ রথ হৃদয় সারথি।
যাহা লৈয়া যায় তাহা যায় জীব রথী॥
আমি কি করিব মন ইহা লৈয়া আইল।
জগন্নাথ দরশনে বিচার না কৈল॥
প্রভু কহে যাহ শীঘ্র কর দরশন।
ঐছে ঘর যাই কর কুটুম্ব মিলন॥
প্রভু আজ্ঞা পাঞা রায় চলিলা দর্শনে।
রায়ের প্রেম ভক্তি রীতি বুঝে কোন জনে॥

কৃপাকিরণ আসন্ন বলিয়াই রাজা ভক্তসেবা করিয়া অর্থাৎ রায় রামানন্দকে অবসর দিয়া ও বেতন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া কৃপালাভের যোগ্যতা অর্জ্জন করিলেন। প্রভু নিজে বলিয়াছেন—

"আমার ভক্তের পূজা আমা হৈতে বড়।"

ছোট দশকুশী।

হেথা রাজা ক্ষেত্রে আসি, সার্ব্বভৌমগৃহে পশি,
নমস্করি পুছিল তাঁহারে।
বল বল কৃপা করি, পতিতপাবন গৌরহরি,
মোরে কিনা কৈল অঙ্গীকারে॥

ভজন—দাসপাঁড়িয়া।

তিঁহত গোলোক স্বামী, নরকের কীট আমি,
বিষয়-বিষ্ঠা-গর্ত্তে ডুবি মরি।
হেন কি হইবে মোরে, বাঁধিয়া করুণা ডোরে,
চরণে তুলিবে কেশে ধরি॥

রায়রামানন্দের কৃপায় প্রভু প্রতাপরুদ্রের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন—"এই গুণে কৃষ্ণ তাঁরে করিব অঙ্গীকার।" প্রভু ভঙ্গী করিয়া প্রতাপ-রুদ্রের সৌভাগ্যের কথা ইঙ্গিতে জানাইলেন। জাতানুরাগ প্রতাপরুদ্রের অবস্থা এখন মুগ্ধা নায়িকার মত প্রেমের যে যে দশা অনুরাগী ভক্তের প্রাণে উদয় হইয়া থাকে তাহা নায়ক নায়িকার ভাব ব্যতীত আর কোনও ভাবের দ্বারা বুঝান যাইতে পারে না—তাই কৃষ্ণপ্রেমের বর্ণনা করিতে হইলে পরকীয় ভাবের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। গোপীভাব যে একটা কাল্পনিক উপন্যাস নহে তাহা যে কোনও প্রেমিক ভক্তের জীবন-চরিত্র আলোচনা করিলেই বোঝা যাইতে পারে; রাজা হউক, ভিখারী হউক বালক হউক, বৃদ্ধ হউক, পুরুষ হউক কিম্বা নারী হউক, ব্যবহারিক জগতে যে কোনও অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন, প্রেমের হাওয়া গায়ে লাগলেই, জীবমাত্রেই ভাবদেহে নায়িকা সাজিতে থাকে। পূর্ব্বরাগ লালসা, উৎকণ্ঠা, ইত্যাদি অবস্থা অংক্ষ্যে জাতানুরাগ জীবের জীবনে

তোমা সবার কৃপাগুণে, স্থান কিগো সে চরণে,
মোহেন অধম জনে পাবে।
বিষয় গরল পিয়া জর জর মোর হিয়া,
অমিয়া পরশে জুড়াইবে॥
গৌরাঙ্গের সঙ্গীগণে, নিত্য সিদ্ধ করি মনে,
সেবাসুখে কাটাইব কাল।
হেন কি হইবে মোর, কাটিবে দুঃখের ঘোর,
দূরে যাবে মায়ার জঞ্জাল॥

আসিয়া উপস্থিত হয়। তখন বৃদ্ধের বার্দ্ধক্যজ্ঞান থাকে না, রাজার রাজোচিত ঐশ্বর্য্য ও পদমর্য্যাদার কথা মনে থাকে না, পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যাভিমান থাকেনা। তখন প্রেমের যে সহজ মূর্ত্তি, অনুরাগের যে সহজ দশা একটীর পর একটী ক্রমে ক্রমে ফুটিয়া অবিশ্বাসী অন্ধ জীবকে দেখাইয়া দেয় যে, গোপীভাব একটা সার্ব্বজনীন সনাতন ভাব। জীবমাত্রেই গোপী, জীবমাত্রেই প্রাণবন্ধুর মহারসের খেলার সাথী, প্রেমের ভাষা সর্ব্বত্রই এক প্রকার, প্রেমের গতি সর্ব্বত্র একপ্রকার—প্রেম সর্ব্বশুচি; আধারভেদে ও অবস্থাভেদে দেখিতে মলিন বোধ হইলেও বাস্তবিক সে কখনও মলিন হইতে পারে না। প্রেম চিরভাস্বর জ্যোতির্ম্ময় দিব্য পদার্থ।

আজ সেই প্রেমের প্রভাবে মহাপরাক্রান্ত বীর মহারাজ প্রতাপরুদ্রের সকল পরাক্রম তুচ্ছ হইয়া গেল; রাজা প্রতাপরুদ্র আপনার সকল ঐশ্বর্য্যকে অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া গৌরধন লাভের আশায় পাগল হইলেন এবং যাঁহারা সেই ধনে ধনী হইয়াছেন তাঁহাদের দ্বারে যাইয়া দীনহীন ভিখারীর মত অঞ্জলি পাতিয়া দাঁড়াইলেন।

রাধাভাব এক নিত্যতত্ত্ব। প্রতি জীবের আধারেই তাহা এমনই করিয়া স্ফুরণ হইয়া থাকে। রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রাণে গৌরপ্রেমের

রাজার আরতি শুনি, বৈষ্ণবের শিরোমণি,
বাসুদেব প্রেমে গলি গেল।
কহিতে নিঠুর কথা, পরাণে লাগয়ে ব্যথা,
অধোমুখে ভাবিতে লাগিল॥
সার্ব্বভৌম হেরি মৌন. অনুমানি বিবরণ,
শিরে কর হানি কাঁদে রায়॥
পতিতপাবন অবতারে, উদ্ধারিলা যারে তারে,
চড়াইয়া হরিনামের সায়।
জগা মাধা পাপী ছিল, গোরা তারে উদ্ধারিল,
জগদ্ উদ্ধারিতে অবতার।
হেন কৃপা অবতারে, করুণা না হবে মোরে,
হেন বুঝি প্রভুর অঙ্গীকার॥

অঙ্কুর হইয়াছে আর পার্থিব সম্পৎ, লৌকিক প্রতিষ্ঠা পদমর্য্যাদা ইত্যাদি সংসারের যাবতীয় পদার্থে বিরাগ জন্মিয়াছে: আজ গৌরভক্ত ব্যতীত অপর কাহারও সঙ্গ আর তাঁহার ভাল লাগে না, গৌর বলিয়া বিরলে বসিয়া কাঁদিতে ইচ্ছা হয়, গৌর যে পর্য্যন্ত আপন বলিয়া গ্রহণ না করিতেছেন—জীবন দুর্ব্বিষহ বলিয়া বোধ হইতেছে। আজ মহারাজ প্রতাপরুদ্র 'গৌর'প্রেমের নায়িকা; গৌরকে পাইতে যদি কুল, মান, রাজ্য, সম্পৎ—সব যায় তাহাও স্বীকার—কিন্তু তবু 'গৌর'কে আপন করিয়া পাওয়া চাই; মহাবীর প্রতাপরুদ্র আজ সামান্য একটী রমণীর মত কাঁদিয়া আকুল,—লজ্জা নাই, সঙ্কোচ নাই, রাজগিরির কিছুই নাই। হা রে—গৌরপ্রেম! রাজা প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া দিলেন; হয় গৌরকৃপা লাভ করব না হয় প্রাণ ত্যাগ করব—রাজ্য ধন তো দূরের কথা!

বিহাগড়া—দাসপাঁড়িয়া।

তাঁর প্রতিজ্ঞা না করিব রাজ দরশন।
মোর প্রতিজ্ঞা তাঁহা বিনা ছাড়িব জীবন॥
যদি সেই মহাপ্রভুর না পাই কৃপা ধন।
কিবা রাজ্য কিবা দেহ সব অকারণ॥
এত শুনি ভট্টাচার্য্য স্তম্ভিত হইল।
প্রেমাবিষ্ট হইয়া রায়ে আলিঙ্গন দিল॥
ভট্টাচার্য্য কহে দেব না কর বিষাদ।
তোমার উপর প্রভুর হবে অবশ্য প্রসাদ॥
তিঁহ প্রেমাধীন তোমার প্রেম গাঢ়তর।
অবশ্য করিবে কৃপা তোমার উপর॥
তথাপি কহিয়ে আমি এক উপায়।
এই উপায় করি প্রভু দেখিবে যাহায়॥
রথযাত্রা দিন প্রভু সব ভক্ত লৈয়া।
রথ আগে নৃত্য করে প্রেমাবিষ্ট হইয়া॥
প্রেমাবেশে পুষ্পোদ্যানে করেন প্রবেশ।
সেই কালে তুমি একা ছাড়ি রাজ বেশ॥
কৃষ্ণ-রাস-পঞ্চাধ্যায়ী করিতে পঠন।
একলে গিয়া মহাপ্রভুর ধরিবে চরণ॥
বাহ্যজ্ঞান নাহি সে কালে কৃষ্ণ নাম শুনি।
আলিঙ্গন করিবে তোমায় বৈষ্ণব জানি॥
শুনি গজপতি মনে সুখ উপজিল।
প্রভুর মিলিতে এই যুক্তি দৃঢ় কৈল॥

স্নান যাত্রা কবে হবে পুছিল ভট্টেরে।
ভট্ট কহে তিনদিন আছয়ে যাত্রারে॥

বেহাগ—দাসপাড়িয়া।

রাজা কহে পরিছারে আমি আজ্ঞা দিব।
বাসাদি যে চাহি পরিছা সব দিব॥
মহাপ্রভুর গণ যত আইল গৌড় হইতে।
ভট্টাচার্য্য একে একে দেখাহ আমাকে॥
ভট্ট কহে অট্টালিকা কর আরোহণ।
গোপীনাথ চিনে সবাকে করাবে দর্শন॥

বৈষ্ণবগণের গান।

নামকীর্ত্তন—বরাড়ী।

ভজ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ।
হরে কৃষ্ণ হরে রাম শ্রীরাধে গোবিন্দ॥

বড়দাস—পাহিড়া।

রাজা কহে দেখি আমার হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ নাহি দেখি আর॥
কোটী সূর্য্য সম সবার উজ্জ্বল বরণ।
কভু নাহি শুনি এই মধুর কীর্ত্তন॥

গৌরাঙ্গে অনুরাগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজার গৌরভক্তের উপরও অনুরাগ হইয়াছে সুতরাং প্রেমের সনাতন রীতি অনুসারে গৌরভক্তগণের ক্র কলাপ সকলই রাজার নিকট অতি মধুর বলিয়া বোধ হইতেছে।

ঐছে প্রেম ঐছে নৃত্য ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে কাঁহা নাহি শুনি॥
ভট্টাচার্য্য কহে তোমার সুসত্য বচন।
চৈতন্যের সৃষ্ট এই নামসংকীর্ত্তন॥
অবতরি চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম প্রচারণ।
কলিকালের ধর্ম্ম কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তন॥
সংকীর্ত্তন যজ্ঞে তাঁর করে আরাধন।
সেই ত সুমেধা আর কলিহত জন॥
রাজা কহে শাস্ত্রপ্রমাণ চৈতন্য হয় কৃষ্ণ।
তবে কেন পণ্ডিত সব তাহাতে বিতৃষ্ণ॥
ভট্ট কহে তার কৃপা লেশ হয় যারে।
সেই সে তাঁহারে কৃষ্ণ করি লৈতে পারে॥

রাজা চিরকাল বিধির দাসত্ব করিয়া আসিয়াছেন। বিধিনিষেধের ব্যবস্থাদাতা পণ্ডিতগণ স্মৃতি খুলিয়া রাজার ধর্ম্মাচরণের পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়া আসিয়াছেন; আজ ভাগ্যক্রমে গৌরাঙ্গের কৃপার বাতাস গায়ে লাগিলেও স্মার্ত্ত পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের যেমন বাসিমুখে মহাপ্রসাদভক্ষণে খট্‌কা উপস্থিত হইয়াছিল— রাজা প্রতাপরুদ্রেরও তেমনই খট্‌কা উপস্থিত হইল। তাই প্রতাপরুদ্র যখন দেখিলেন ভক্তগণ জগন্নাথক্ষেত্রে পৌছিয়াও জগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়াই গৌরচাঁদকে দর্শন করিতে ছুটিলেন এবং তীর্থে ক্ষৌরকার্য্য ও স্নানাদি না করিয়াই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিলেন তখন তিনি তাঁহার চিরাচরিত বিধির নজীর টানিয়া তুলিলেন—কিন্তু এমনই প্রভুর কৃপা যে, সে আপত্তি খণ্ডন করিতে যাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় অধিকারী তৎকালে ভূ-ভারতে আর কেহ ছিলেন না,

কেদার—একতালী।

রাজা কহে সবে জগন্নাথ না দেখিয়া।
চৈতন্যের বাসায় আগে চলিলা ধাইয়া ॥
ভট্ট কহে এই স্বাভাবিক প্রেম রীত।
মহাপ্রভু মিলিতে সবার উৎকণ্ঠিত চিত ॥
আগে তাঁরে মিলি সবে তাঁরে আগে লৈঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবে আসিয়া ॥
* রাজা কহে ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ।
মহাপ্রসাদ লৈঞা সঙ্গে জন পাঁচ সাত ॥
ভট্ট কহে ভক্তগণ আইল জানিঞা।
প্রভুর ইঙ্গিতে প্রসাদ যায় তাহা লঞা ॥
রাজা কহে উপবাস ক্ষৌর তীর্থের বিধান।
তাহা না করিয়া কেনে খাবে অন্নপান ॥
ভট্ট কহে তুমি কহ সেই বিধি ধর্ম্ম।
এই রাগ মার্গের আছে সূক্ষ্ম ধর্ম্ম কর্ম্ম ॥
ঈশ্বরের পরোক্ষ আজ্ঞা ক্ষৌর উপোষন।
প্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা প্রসাদ ভক্ষণ ॥

—সেই মহামহোপাধ্যায় সার্ব্বভৌম আজ প্রেমধর্ম্মের রাগমার্গের অপূর্ব্ব যুক্তি দ্বারা রাজার সেই আপত্তি খণ্ডন করিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে এই সার্ব্বভৌমই রাজার বিধিধর্ম্মের ব্যবস্থাদাতা ছিলেন এবং রাজার বিধিধর্ম্মের পালক ও পোষক এই সার্ব্বভৌমই ছিলেন। আজ প্রেমধর্ম্মের আগুণে সে বিধিধর্ম্ম ছাই হইয়া গিয়াছে। ধন্য গৌরকৃপা!

* এই দর্শনের পর রাজা কটকে চলিয়া গেলেন এবং তথা হইতে সার্ব্বভৌমের নিকট প্রভুর অনুমতির আশায় পত্র দিলেন। সার্ব্বভৌম উত্তরে জানাইলেন যে এখনও প্রভুর আজ্ঞা পাওয়া যায় নাই।

তাঁহা উপবাস যাঁহা নাহি মহাপ্রসাদ।
প্রভু আজ্ঞা প্রসাদ ত্যাগ হয় অপরাধ॥

যথারাগ—ঝপতাল।

দামোদর কহে তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর।
কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সব তোমার গোচর॥
আমি কোন্ ক্ষুদ্র জীব তোমারে বিধি দিব।
আপনি মিলিবে তাঁরে তাহাও দেখিব॥
নিত্যানন্দ কহে ঐছে হয় কোন জন।
যে তোমারে কহে কর রাজারে মিলন॥

রাজা পুনরায় পত্র পাঠাইলেন এবং অত্যন্ত কাতরভাবে প্রভুর সমীপস্থ যাবতীয় ভক্তমণ্ডলীকে দয়া করিয়া রাজার জন্য প্রভুর চরণে প্রার্থনা করিতে বলিলেন। সার্ব্বভৌম রাজার আর্ত্তি দেখিয়া শ্রীপাদ নিত্যানন্দের নিকট রাজার প্রার্থনা নিবেদন করিলেন। পরমদয়াল নিত্যানন্দ জীবের উপর অবিচারে দয়া করেন, সুতরাং সার্ব্বভৌমের কথা শ্রবণমাত্রই প্রভুর নিকট প্রতাপরুদ্রের আর্ত্তির কথা বলিলেন ও তাহাকে কৃপা করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রভু নিতাইর কথা শুনিয়া কপট ক্রোধ করিয়া বলিলেন—"আমি সন্ন্যাসী, বিষয়ীর সঙ্গ আমার বিষতুল্য, এমতাবস্থায় তোমাদের কথায় যদি রাজার সঙ্গে মিলি—তবে আমার ধর্ম্ম বা কেমন ক'রে থাক্‌বে—আর লোকেই বা কি বল্‌বে? আর অন্য দূরস্থান দামোদর আমাকে কি বল্‌বে?" প্রভুর এই বাক্য শুনিয়া দামোদর কহিলেন,—"তোমার চতুরালী তো আমাদের জান্‌বার বাকী নাই যে, আমাদিগকে ভাঁড়াবে প্রভু! আজ প্রতাপরুদ্রের বিরুদ্ধে তো কত যুক্তি তর্ক আওড়ান হ'চ্ছে কিন্তু তুমি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নিজেই আবার প্রতাপরুদ্রকে আত্মসাৎ

কিন্তু অনুরাগী লোকের স্বভাব এক হয়।
ইষ্ট না পাইলে নিজ পরাণ ছাড়য় ॥
তৈছে যুক্তি করি যদি কর অবধান।
তুমি না মিলহ তারে রহে তার প্রাণ ॥
এক বহির্বাস যদি দেহ কৃপা করি।
তাহা পাঞা প্রাণ রাখে তোমার আশা ধরি ॥
প্রভু কহে তুমি সব পরম বিদ্বান।
যেই ভাল হয় সেই কর সমাধান ॥

বড়দাসপাড়িয়া।

প্রভুর প্রসাদী বাস অগ্রেতে হেরিয়া।
দণ্ডবত হৈয়া পড়ে ভুমিতে লোটাঞা ॥
(গড়াগড়ি যায় রে) (ধূলিতে পড়িয়া রায়)
(তৃণ হতে দীন হয়ে)

করবে—তাহাও আমরা দেখব; সুতরাং দামোদরের উপর আর কর্ত্তালী দেওয়ার প্রয়োজন নাই প্রভু। তোমার যাহা ইচ্ছা তাহাই পূর্ণ কর।" প্রভুর কৃপা,—ভক্তের প্রার্থনায়,প্রসাদীবস্ত্রের সঙ্গে রাজা প্রতাপরুদ্রের পুরী পবিত্র করিতে ও রাজার অনুরাগ দৃঢ়তর করিয়া লালসা বাড়াইতে চলিল বিষয়ী লোকের বিষয়ে মন নিবিষ্ট হইয়া গেলে—সেই মনকে উঠাইয়া ভগবৎপাদপদ্মে সংলগ্ন করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া ওঠে। রাজা প্রতাপরুদ্র গৌরলীলার মহাজন বলিয়া প্রভুরই ইচ্ছায় গৌরপ্রেমে মাতিয়া গেলেন; কিন্তু তথাপি তাহার প্রেমের গাঢ়তা কতটুকু তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য আমাদের মত অবিশ্বাসী জীবকে শিক্ষা দিবার জন্য

কেদার—দোতালী।

(তবে) আসন গড়িয়া, বসন ধরিয়া,
প্রভু জ্ঞানে পূজে তারে।
(আনন্দের সীমা নাই রে) (প্রভু কৃপা চিহ্ন লভি)
দিবস রজনী গোরা নাম খানি,
সতত নাচে অধরে ॥
(যেন সেই) আভীরী বালিকা, প্রেমের কলিকা,
দিনে দিনে আশা বাড়ে।
গৌর বলিয়া, বেড়ায় নাচিয়া,
আপন অঙ্গন ঘরে ॥
(ঘরের বাহির হ'তে নারে) (রাজ ভরম ত্যজিয়া রে)

প্রভু প্রতাপরুদ্রকে আরও পাগল করিয়া তুলিলেন। রাজার উৎকণ্ঠা ক্রমেই তীব্রজ্বালায় পরিণত হইয়া তাঁহকে আরও আত্মহারা করিয়া তুলিল। তখন এত বড় রাজারও যে কি দশা হয় তাহাই বর্ণনা করা হইতেছে। গৌরপ্রেমে মাতোয়ারা রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট প্রভুর প্রসাদীবস্ত্রই প্রভুর স্থান লাভ করিয়াছে। প্রেমিকের নিকট প্রেমপাত্রের সব জিনিষেরই এইরূপ মর্য্যাদা হইয়া থাকে।

রাজা প্রতাপরুদ্রের সকল ঐশ্বর্য্য আজ তাঁহার নিকট তুচ্ছ হইয়া গিয়াছে ; আজ গৌরধন তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ সম্পদ্— এবং যাঁহারা সেই গৌরধনে ধনী তাঁহাদের তুলনায় রাজা আজ নিজকে নিতান্ত দীন ও কাঙ্গাল বলিয়া মনে করিতেছেন ও তাঁহাদের সেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিবার জন্য তাঁহার প্রাণে আকুল আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে। তাই নিজপদমর্য্যাদার মাথায় পা দিয়া, ঐশ্বর্য্যের গৌরবে জলাঞ্জলি দিয়া রাজা

বাসু রামানন্দে, মিলয়ে আনন্দে,
চরণে ধরিয়া কাঁদে।
(তোমরা মোরে দয়া কর) (তোমরা গৌর ধনে ধনী ওগো)
করুণা করিয়া, পরাণ রাখহ,
মিলাইয়া গোরাচাঁদে॥
(আমি কি এমনি রব) (গোরার রাঙ্গাচরণ পাব নাকি)
রাজার রোদনে, পাইয়া বেদনে
সাধু রামানন্দ রায়।
প্রভুর চরণে, করি নিবেদনে,
কাতর নয়নে চায়॥
(শরণাগতে করুণা কর) (দয়াময় পতিতপাবন)
(এই ভিক্ষা চরণে মাগি)
রামানন্দ বাণী, শুনি গোরা মণি,
করুণ ঈক্ষণে চায়।
সে আঁখি হেরিয়া, গোবিন্দ দাসিয়া
কেন না গলিয়া যায়॥

আজ অকিঞ্চন গৌরভক্তগণের চরণ ধরিয়া লুটাপুটি করিয়া কাঁদিতেছেন। গৌরাঙ্গের কৃপা এমনই কত অঘটন ঘটাইয়া থাকে। প্রভু গজপতি প্রতাপরুদ্রকে একটু একটু করিয়া দান করিতেছেন আর তাঁহার পিপাসা আরও বাড়াইয়া তুলিতেছেন। রাজা প্রসাদী বস্ত্র পাইয়াছিলেন—এবার গৌর অঙ্গ গন্ধ পাইয়া পাগল হইলেন। তারপর দেখিতে দেখিতে রথযাত্রার শুভদিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নীলাচলনাথ শুভক্ষণে

যথারাগ—জপতাল।

প্রভু কহে আমি মনুষ্য আশ্রমে সন্ন্যাসী।
কায়মনোবাক্যে ব্যবহারে ভয় বাসি॥
সন্ন্যাসীর অল্প ছিদ্র বহু লোকে গায়।
শুক্ল বস্ত্রে মসীবিন্দু যৈছে না লুকায়॥
রায় কহে কত পাপীর করিয়াছ অব্যাহতি।
ঈশ্বর সেবক তোমার ভক্ত গজপতি॥
প্রভু কহে পূর্ণ যৈছে দুগ্ধের কলস।
সুরাবিন্দুপাতে কেহ না করে পরশ॥
যদ্যপি প্রতাপরুদ্র সর্ব্ব গুণবান্।
তাহারে মলিন করে এক রাজ্য নাম॥
তথাপি তোমার যদি মহাগ্রহ হয়।
তবে আনি মিলাহ মোরে ত'হার তনয়॥
'আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ' এই শাস্ত্র বাণী।
পুত্রের মিলনে যেন মিলিলা আপনি॥

যথারাগ—গড়খেম্‌টা।

সুন্দর রাজার পুত্র শ্যামলবরণ।
কিশোর বয়স দীর্ঘ চপল নয়ন॥
পীতাম্বর ধরে অঙ্গে রত্ন আভরণ।
কৃষ্ণ স্মরণের তিঁহ হৈল উদ্দীপন॥
তারে দেখি মহাপ্রভু কৃষ্ণ স্মৃতি হৈলা।
প্রেমাবেশে মিলি তারে কহিতে লাগিলা॥
এই মহাভাগবত যাহার দর্শনে।

ব্রজেন্দ্রনন্দন স্মৃতি হয় সর্ব্বক্ষণে॥
কৃতার্থ হইলাম আমি ইহার দর্শনে।
এতবলি পুনঃ তারে কৈল আলিঙ্গনে॥
প্রভুস্পর্শে রাজপুত্র হৈল প্রেমাবেশ।
স্বেদ কম্প অশ্রু স্তম্ভ যতেক বিশেষ॥
তবে মহাপ্রভু তারে ধৈর্য্য করাইল।
নিত্য আসি মিল মোরে এই আজ্ঞা দিল॥

ছোটদশকুশী।

কোলে ধরি নিজ সুতে, চুম্বন করিলা মাথে,
অশ্রুজলে করাইল স্নান।

বেহাগ—একতালী।

গৌর অঙ্গ গন্ধ পাইয়া, দেহ গেহ আমোদিয়া,
পাগল করিল মনঃ প্রাণ॥
(সেই না গোরা অঙ্গ গন্ধ) (পারিজাত হারিমানে)
বুক হৈতে শিরে ধরি, নাচে বলি গৌর হরি,
তুঙ্গ লম্ফে ইতি উতি ধায়।
কভু কাঁদে কভু হাসে, নয়ন জলেতে ভাসে,
হুহুঙ্কারে মেদিনী কাঁপায়॥

দাদা বলরাম ও ভগিনী সুভদ্রাদেবীসহ 'পহণ্ডীবিজয়' করিয়া রথে আরোহণ করিলেন এবং সচল জগন্নাথ শ্রীশ্রীগৌরহরি পার্ষদপরিকর ও অসংখ্য ভক্তবৃন্দ লইয়া মহাসংকীর্ত্তনে মাতিয়া গেলেন।

প্রতাপরুদ্রের সাধনা কাননে আজ ফুল ফুটিবে, রাজা আজ দীনহীন

ক্ষণ পরে ধৈর্য্য ধরি, পুনঃ সুতে বুকে করি,
কহে আজি ধন্য কৈলা মোরে।
আজি হৈতে পিতা তুই, তোঁহারি সন্তান মুই,
গৌরকৃপা আনিলা এ ঘরে॥
এই কৃপা কর মোরে, যেন অবলম্বি তোরে,
গৌর পদে পারি মিলিবারে।
দুঃখিয়া গোবিন্দ কয়, আর তব নাহি ভয়,
দয়াল প্রভু মিলিবে অচিরে॥

জয়জয়ন্তী—দোঠুকী।

চৌদিকে মোহান্ত মেলি, করয়ে কীর্ত্তন কেলি,
সাত সম্প্রদায়ে গায় গীত।

প্রজার বেশ ধারণ করিয়া সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া হীন সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছেন; হস্তে সম্মার্জ্জনী লইয়া সপার্ষদ গৌরহরির পথ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন—আজ রাজা প্রতাপরুদ্র যেন মরিয়া গিয়াছেন, তৎপরিবর্ত্তে তাহার স্থানে একটী তৃণাদপি সুনীচ আদর্শ বৈষ্ণব যেন গৌরাঙ্গগমনপথ মার্জ্জনা করিয়া দিতেছেন· এই দীনতায় গৌর মিলিল। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত প্রেমধর্ম্মে দৈন্য বড় উচ্চসাধন। প্রভু তখন বাহ্যশূন্য হইয়া নাচিতেছেন এবং উহারই মধ্যে অদ্ভুত শক্তি বিকাশ করিতেছেন। সাত সম্প্রদায়ে কীর্ত্তন হইতেছিল, প্রভু শক্তিপ্রকাশ করিয়া যুগপৎ সাত সম্প্রদায়ে থাকিয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন। এক গৌরাঙ্গ সাত গৌরাঙ্গ হইয়া নাচিতে লাগিলেন।

প্রভুর নৃত্যে যেন সমস্ত ভুবন নৃত্য করিতে লাগিল; রাজা অনিমেষ

বাজে চতুর্দ্দশ খোল, গগন ভেদিল রোল,
দেখি জগন্নাথ আনন্দিত ॥
উন্মত্ত নিত্যানন্দ, আচার্য্য অদ্বৈতচন্দ্র,
পণ্ডিত শ্রীবাস হরিদাস।
এ সভারে সঙ্গে করি, মাঝে নাচে গৌরহরি,
ভকত মণ্ডল চারি পাশ ॥
হরি হরি বোল বোলে, পদভরে মহী দোলে,
নয়ানে বহয়ে জল ধার।
প্রেমের তরঙ্গ রঙ্গ, সুমেরু জিনিয়া অঙ্গ,
তাহে অষ্ট সাত্ত্বিক বিকার ॥
ভাবাবেশে গোরারায়, নাচিতে নাচিতে যায়,
ধীরে ধীরে চলে জগন্নাথ।
আনন্দ বিস্ময় মন, দেখি প্রেম সংকীর্ত্তন,
নিজ পরিকরগণ সাথ ॥

নয়নে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন ; এমন সময় শ্রীনিবাস নাচিতে নাচিতে রাজার সম্মুখে আসিয়া পড়িলেন ; ইহা দেখিয়া রাজার ভৃত্য হরিচন্দন শ্রীনিবাসকে আস্তে আস্তে রাজার সম্মুখ হইতে একপাশে সরিয়া যাইতে বলিলেন। কিন্তু শ্রীবাস বাহ্যশূন্য হইয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিতেছিলেন ও ভাবাবেশে নৃত্য করিতেছিলেন তিনি হরিচন্দনের কথা গ্রাহ্য করিলেন না ; ইহাতে হরিচন্দন রাজার অগ্রভাগ হইতে তাঁহাকে সরাইবার জন্য ঠেলা দিয়া দিলেন। শ্রীনিবাস ভাবাবিষ্টাবস্থায় ক্রুদ্ধ হইয়া হরিচন্দনকে এক চাপড় মারিলেন।

হরিচন্দন রাজার সম্মুখে একটা বৈরাগীর হাতে এইরূপ অপমানিত

দূরে গেল দুঃখ শোক, প্রেমায় ভাসিল লোক,
স্থাবর জঙ্গম পশুপাখী।
সে প্রেম বিলাস ধাম, যদু কহে অনুপাম,
যে দেখিল সেই তার সাখী॥

বেহাগ—একতালা

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
স্বর্ণ মার্জ্জনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জ্জন॥
চন্দন জলে করেন পথ নিসিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ সিংহাসনে॥
অদ্ভুত শক্তি প্রভু করিলা প্রকাশ।
এক কালে সাত ঠাঞি করেন বিলাস॥
পূর্ব্বে যৈছে রাসলীলা কৈলা বৃন্দাবনে।
অলৌকিক লীলা গৌর কৈলা ক্ষণে ক্ষণে॥
প্রতাপরুদ্র হৈল পরম বিস্ময়।
দেখিতে বিবশ রাজা হৈল প্রেমময়॥

* * *

ভাগ্যবান তুমি ইহার হস্তস্পর্শ পাইলা।
আমার ভাগ্যে নাহি তুমি কৃতার্থ হইলা॥

* * *

হইয়া প্রতিশোধের জন্য হাত উঠাইলে রাজা তাহার হাত ধরিয়া তাহাকে নিরস্ত করিলেন এবং বলিলেন—"ভাগ্যবান্" ইত্যাদি।

রথযাত্রাবিজয় শেষ হইলে কীর্ত্তনান্তে প্রভু যাইয়া এক উপবনে প্রেমাবেশে এক উদ্যানগৃহপিণ্ডায় শয়ান হইয়া রহিলেন। এদিকে রাজা প্রতাপরুদ্র সার্ব্বভৌমের কথামত ভক্তগণের আজ্ঞা শিরে ধারণ করিয়া

এইমত প্রভু নৃত্য করিতে করিতে।
প্রতাপরুদ্রের আগে লাগিল পড়িতে ॥
সম্ভ্রমে প্রতাপরুদ্র প্রভুকে ধরিল।
তাহারে দেখিতে প্রভুর বাহ্য জ্ঞান হৈল ॥
বিষয়ী-পরশে প্রভু বাহ্য বোধ করি।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি দূরে চলিলেন সরি ॥

তুড়ীগৌরী—একতালা

সব ভক্তের আজ্ঞা লইয়া, করযোড়ে আগে যাইয়া,
সাষ্টাঙ্গে পড়িল প্রভুর চরণে।
আঁখি মুদি গোরা রায়, অন্তরে সকল ভায়,
বাহিরে আছেন যেন শয়নে ॥
চরণ যুগল ধরি, উঠাইলা বক্ষোপরি,
ধীরে ধীরে করে সম্বাহন।
রাসলীলা শ্লোক পড়ি, স্তুতি কৈলা গৌরহরি,
শুনি প্রভুর তুষ্ট হৈল মন ॥
শুনিতে শুনিতে গোরা, প্রেমে হৈলা আত্মহারা,
বোল বোল বলি আজ্ঞা কৈল।
'তব কথামৃত' শ্লোকে, পড়িলা মনের সুখে,
শুনি প্রভু রাজায় আলিঙ্গিল ॥
তুমি মোরে বহু দিলে অমূল্য রতন।
মোর কিছু দিতে নাহি দিনু আলিঙ্গন ॥

বড় সাহস করিয়া প্রভুর চরণসম্বাহন করিয়া রাসলীলার শ্লোক পাঠ করিতে লাগিলেন।

এত বলি এই শ্লোক পড়ে বার বার।
দুইজনার অঙ্গে কম্প নেত্রে জল ধার ॥

* * * *

প্রভু কহে কে তুমি করিলে মোর হিত।
আচম্বিতে আসি পিয়াও কৃষ্ণলীলামৃত ॥
রাজা কহে আমি তোমার দাসের অনুদাস।
ভৃত্যের ভৃত্য কর মোরে এই মোর আশ ॥
দেখি আনন্দিত হৈল যত ভক্তগণ।
জয় গৌরহরি বলি করয়ে কীর্ত্তন।

ইতি প্রতাপরুদ্র-উদ্ধার পালা সমাপ্ত।

শ্রীশ্রীহরিদাসের নির্য্যাণ।

প্রার্থনা।

ধানশ্রী – লোফা

হা কৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু পতিতপাবন।
দাস বলে দয়া কর মুই অভাজন ॥
(দাসে দয়া হ'ক হে)   (প্রাণ গৌরাঙ্গ মোর)
দয়া কর অবধূত জাহ্নবা জীবন।
পদ্মাবতী প্রাণধন বসুধা বীরণ ॥
(তুমি দীনের গতি হে)   (প্রাণ নিত্যানন্দচন্দ্র)

---

* তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ ॥
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩১।৯

ছোট—দশকুশি।

কোথা শান্তিপুরেশ্বর, কিঙ্করে করুণা কর,
কোথা মোর প্রাণ গদাধর।
(দাসে কৃপা রাখগো) (প্রাণাদ্বৈত গদাধর)
কোন প্রভু শ্রীবাস, মুকুন্দ হরিদাস,
হে রূপ স্বরূপ দামোদর ॥
(কৈ কৈ কৈ মোর) (প্রাণ স্বরূপ প্রাণ)
কারুণ্যেক্ষণে হের "কীট-ইন্দ্রজাল।"
বন্ধু বাঞ্ছা ; শুভ দৃষ্টি "প্রভু দয়াল।"
(জীবে দয়া কর) (কেবল ও কীট কুহক "ও")
(হরিকথা)

(অথ পালা আরম্ভ।)

কথা। *

সুহইরাগ—জোতসোমতাল।

এই মত মহাপ্রভুর নীলাচলে বাস।
সঙ্গে ভক্তগণ লৈয়া কীর্ত্তন বিলাস॥
দিনে নৃত্য কীর্ত্তন ঈশ্বর দরশন।
রাত্রে রায় স্বরূপ সনে রস আস্বাদন॥

* শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর ২৪ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আরও ২৪ বৎসর এ জগতে প্রকট লীলা করিয়াছেন। তন্মধ্যে ৬ বৎসর

কৃষ্ণের বিরহ বিকার অঙ্গে নানা হয়।
দিনে দিনে বাড়ে বিকার রাত্রে অতিশয় ॥
* * * *
একদিন গোবিন্দ মহাপ্রসাদ লইয়া।
হরিদাসে দিতে গেল আনন্দিত হইয়া ॥
দেখে হরিদাস ঠাকুর করিয়াছে শয়ন।
মন্দ মন্দ করিতেছে সংখ্যা সংকীর্ত্তন ॥
গোবিন্দ কহে উঠে আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আমি করিব লঙ্ঘন ॥
সংখ্যাকীর্ত্তন নাহি পূরে কেমতে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কেমনে উপেক্ষিব ॥
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।
এক রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ ॥

নীলাচল, গৌড়, সেতুবন্ধ, বৃন্দাবন যাতায়াত ও তীর্থ পর্য্যটনে ব্যয় করেন। তারপর—

"অষ্টাদশ বর্ষ কৈল নীলাচলে স্থিতি।
আপনে আচরি লোকে শিক্ষাইল ভক্তি ॥
তার মধ্যে ছয় বৎসর ভক্তগণ সঙ্গে।
প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তাইল নৃত্যগীত রঙ্গে ॥
* * * *
শেষ আর যেই রহে দ্বাদশ বৎসর।
কৃষ্ণের বিরহ স্ফূর্ত্তি প্রভুর অন্তর ॥
নিরন্তর রাত্রিদিন বিরহ উন্মাদে।
হাসে কাঁদে নাচে গায় পড়েন বিপদে ॥

গান্ধার—কাটাধরা।

শুনিয়া গোবিন্দ বাণী, দয়াল গোরা গুণমণি,
আর ত থির রইতে নারে গো।
(প্রেমসিন্ধু উথলিল) (ভকত বৎসল ভকত জীবন)
(আজ করুণার বাণ ডাকল প্রাণে।)
দুটী আঁখি ছল ছল, করুণা ঢল ঢল
ভকত বৎসল গোরা রায়।
চঞ্চল চরণে, চকিত নয়নে,
ভকত চকোর পাশে ধায়॥
(এই গোরা প্রেম রে) (খুঁজিয়া যাচিয়া দেয়)
(আমার গোরা চাঁদের হাটে)

ধানশ্রী—দাসপাঁড়িয়া॥

চলিল রে চারুচরণে অকলঙ্ক গোরা শশী।
শ্রীঅঙ্গ কিরণে ধরার পাপতম নাশি॥
(কিবা শোভা শোভারে) (যেন গগনের চাঁদ ভূমে নাচে)
(যেন শত কোটী চাঁদের মেলা)

শ্রীশ্রীঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণলীলা শ্রীশ্রীপ্রভুর নীলাচললীলার উক্ত ছয় বৎসরের শেষভাগেই অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রভুর দ্বাদশ বর্ষব্যাপী দিব্যোন্মাদ অবস্থা ঠাকুর হরিদাসের নির্য্যাণের অত্যল্পকাল পর হইতেই আরম্ভ হয়॥

শ্রীশ্রীগৌরলীলার বিশেষত্ব উপলব্ধি করিতে হইলে এই ভুবনপাবন-লীলার যে যে অংশ বিশেষরূপে প্রণিধান করা উচিত তন্মধ্যে ঠাকুর হরিদাসের প্রতি প্রভুর যে কৃপা ও বাৎসল্য তাহার স্থান বহু উর্দ্ধে

ভজন—দাসপাঁড়িয়া ॥

অমিয়া মথিয়া কেবা, নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গারিল গো,
এক কৈল সুধুই সুলেহ ॥
অখণ্ড পীযূষ ধারা, কেবা আউটিল গো,
সোণার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা, ফেণি তুলিল গো,
হেন বাসোঁ গোরা অঙ্গ খানি ॥

বস্তুতঃ গৌরভগবানের ঐশ্বর্য্যের প্রকাশ ছাড়া ও তাঁহার এই অপরূপ নরলীলায় যে মাধুর্য্যের অভিনয় হইয়াছে, তদ্দ্বারাও তাঁহাকে আমরা মানুষের ভিতরে "অতিমানুষ" বলিয়া ধরিতে পারি। প্রভুর লীলায় হরিদাসের মহানির্ব্যাণ দেখিয়া আমরা তেমন একটী মাধুর্য্যের সঙ্গে পরিচিত হই। হরিদাস শ্রীশ্রীমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত যুগধর্ম্মের এক জীবন্ত বিগ্রহ। প্রভু বলিয়াছিলেন—

"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নাম সংকীর্ত্তন।
নবভাব ভক্তি দিয়া নাচাইমু ত্রিভুবন ॥"

সুধু ইহা বলিয়াই প্রভু ক্ষান্ত হন নাই, উক্ত যুগধর্ম্ম আচরণের পদ্ধতি নিজে আচরণ করিয়া ভক্তগণকে দেখাইয়া দিয়াছেন। যে যে ভক্ত প্রভুর ধর্ম্মের আদর্শকে তৎপ্রদর্শিত পন্থায় বিচরণ করিয়া লাভ করিয়াছেন, হরিদাস তাঁহাদের অগ্রণী। নামসংকীর্ত্তনে যে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করা যায় প্রভুর শিক্ষাষ্টকের প্রতি শ্লোক যে অক্ষরে অক্ষরে সত্য, ভাগবতের অমিয় বাণী "চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠ হরিভক্তি পরায়ণঃ" উহা যে সুধু কথার কথা নহে; প্রভু হরিদাসের জীবনে এই সকল সত্য প্রকাশ

অনুরাগে দধি প্রেমের সাচনা দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটী।
তাহাতে অধিক মহ. লহু লহু কথাখানি
হাসিয়া কহয়ে গুটী গুটী ॥
বিজুরী বাটিয়া কেবা. গা খানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখ খানি।
লাবণ্য বাটিয়া কেবা, চিত নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি।
সকল পূর্ণিমা চাঁদে, বিকল হইয়া কাঁদে,
কর-পদ পদুমের গন্ধে।
এমন বিনোদিয়া, কোথায় দেখি যে নাই
অপরূপ প্রেমের বিনোদে।
কুড়িটি নখের ছটায়, জগত আলো কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে ॥

করিয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ ভগবান্ যে ভক্তকে কি পরিমাণ স্নেহ ও বাৎসল্য দিতে পারেন. ভক্তের জন্ত ভগবানের অদেয় ও অকরণীয় যে কিছুই নাই; ভক্ত যে ভগবানের প্রাণাপেক্ষাও প্রিয়বস্তু. ভক্ত ও ভগবান্ এই দুই তত্ত্বই যে অবিজ্ঞেয়—ভক্তের মহিমা যে স্বয়ং ভগবানই কীর্ত্তন করিয়া আনন্দ পান, ভক্ত যতই দূরে সরিয়া থাকিতে ইচ্ছা করুক্ না কেন, প্রভু যে তাহাকে সর্ব্বদা জোর করিয়াই বুকে টানিয়া লইয়া থাকেন; ভক্ত ও ভগবানের সম্বন্ধ যে মধুর ও অতীব আনন্দের.—প্রভু আপন লীলায় হরিদাসের চরিত্রে তাহা উজ্জ্বল করিয়া দেখাইয়াছেন। হরিদাস ভুবনপাবন ঠাকুর। শ্রীমদ্ভাগবত যে 'নির্মৎসর' "সৎ" ব্যক্তিকে

পুরুষ প্রকৃতিভাবে কাঁদিয়া আকুল গো
নারী বা কেমনে প্রাণ বান্ধে ॥
জয়রে জয়রে জয়, হেন প্রেম রসালয়,
ভাঙ্গি বিলাইল গোরা রায়।
নির্জ্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচনদাস গায় ॥

বড়ারী রাগ,—একতালী।

একলে ঈশ্বর, না লয়ে দোসর,
গেলা হরিদাস ঠাঁই।
ভূমিতে শয়ান, মুদিত নয়ান,
হরিদাসে হেরে যাই ॥

ভাগবতধর্ম্মের অধিকারী বলিয়া গিয়াছেন—হরিদাস সেই আদর্শেরই জীবন্তমূর্ত্তি। শ্রীশ্রীগৌরলীলায় যদি আর কোনও মাধুর্য্যের বা ঐশ্বর্য্যের লীলার অভিনয় না হইত—কেবল ঠাকুর হরিদাসের একমাত্র চরিত্রই যদি গৌরলীলার নিঃশেষ উপকরণ হইত মনে হয় একমাত্র উহাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তার সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিত এবং প্রভুর যুগধর্ম্ম শুধু হরিদাসের জীবন যজ্ঞেই জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত। নামসংকীর্ত্তনের মহিমা বুঝাইতে জীবকে আর অন্য আচার্য্য বা উপদেশের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে না। সে বিষয়ে ঠাকুর হরিদাসের সিদ্ধ জীবনী একাই যথেষ্ট।

আমাদের গৌর এমনই ভক্তবৎসল! সর্ব্বান্তর্য্যামী বিভু শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য গোসাঞি বুঝিতে পারিলেন যে হরিদাস ইহধাম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প; হরিদাসের এ সংকল্পও প্রভুরই ইচ্ছায় হইয়াছে, সুতরাং

ধীরি ধীরি ধীরি পঁহু আগুসারি,
ভকত শিয়র পাশে।
করুণা বাদরে, আঁখি ঝর ঝরে,
কত না আদরে বৈসে॥
চিবুক ধরিয়া, আদর করিয়া,
ডাকিতে লাগিলা লহু।
দয়িতের বাণী, শুনি ভক্তমণি,
কাঁপিয়া উঠিল মুহু॥
নয়ন মেলিয়া, পঁহুরে হেরিয়া
সম্ভ্রমে চাহে উঠিতে।
দুবাহু পশারি, দয়াল গৌর হরি,
ধরিলা আপন বুকেতে॥
বুকেতে টানিয়া রহিলা চাহিয়া,
অনিমিষে মুখপানে।
গোবিন্দ দাসিয়া এ দৃশ্য হেরিয়া
মরিয়া না গেল কেনে॥
(ওরূপ ভাব্‌তে ভাব্‌তে) (ও নাম নিতে নিতে)

তাহাতে বাধা দিলেন না বরং যাওয়ার বেলা হরিদাসকে বিজয়মাল্যে মণ্ডিত করিয়া তাঁহার আজীবনের নামসাধনার সিদ্ধিদান করিবার জন্য সকল বৈষ্ণব মহাজনকে লইয়া প্রভু হরিদাসের সিদ্ধবকুল তলায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। প্রভুর এ আগমন শ্রীমুখের সনাতন বাণীর সার্থকতা সম্পাদনের জন্য; সেই যে গীতায় পাঞ্চজন্যনাদে ঘোষণা করিয়াছিলেন—

(২)

বিহাগড়া—একতালী।

সুস্থ হও হরিদাস তাহারে পুঁছিলা।
নমস্কার করি তিঁহো নিবেদন কৈলা॥
শরীর সুস্থ হয় মোর অসুস্থ বুদ্ধি মন।
প্রভু কহে কোন্ ব্যাধি কহতো নিশ্চয়।
তেঁহ কহে সংখ্যাকীর্ত্তন না পূরয়।
এই দুঃখে দুঃখিত মোর চিত্ত মন॥
প্রভু কহে বৃদ্ধ হৈলে সংখ্যা অল্প কর।
সিদ্ধ দেহ তুমি সাধনেতে আগ্রহ কেন ধর।
লোক নিস্তারিতে তোমার এই অবতার।
নামের মহিমা লোকে করিলা প্রচার॥
এবে অল্প সংখ্যা করি কর সংকীর্ত্তন।
হরিদাস কহে শুন মোর নিবেদন॥
হীন জাতিতে জন্ম মোর নিন্দ্য কলেবর।
হীন কর্ম্মে রত মুঞি অধম পামর॥
অদৃশ্য অস্পৃশ্য মোরে অঙ্গীকার কৈলে।
রৌরব হইতে মোরে বৈকুণ্ঠে চড়াইলে।

"মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।" ১৮।৬৫

"আমাতেই মন নিবিষ্ট কর, আমাকেই ভক্তি কর, আমাকেই ভজ, আমাকেই নমস্কার কর, ঈদৃশ আচরণ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত

স্বতন্ত্র ঈশ্বর তুমি হও ইচ্ছাময়।
জগৎ নাচাও তুমি যৈছে ইচ্ছা হয়॥
অনেক নাচাইলে মোরে প্রসাদ করিঞা।
বিপ্রের শ্রাদ্ধ পাত্র খাইনু ম্লেচ্ছ হইঞা॥
এক বাঞ্ছা হয় মোর বহু দিন হৈতে।
লীলা সংবরিবে তুমি লয় মোর চিতে॥
সেই লীলা প্রভু মোরে কভু না দেখাইবা।
আপনার আগে মোর শরীর পাড়িবা॥
হৃদয়ে ধরিব তোমার কমল চরণ।
নয়নে দেখিব তোমার চান্দ বদন॥
জিহ্বায় উচ্চারিব তোমার কৃষ্ণচৈতন্য নাম।
এই মত মোর ইচ্ছা ছাড়িব পরাণ॥
মোর এই ইচ্ছা যদি তোমার প্রসাদ হয়
এই নিবেদন মোর কর দয়াময়॥
এই বাঞ্ছা সিদ্ধ মোর তোমাতেই লাগে॥
এই নীচ দেহ মোর পড়ে তোমার আগে।

গৌরী—একতালা॥

এই নিবেদন তুয়া পায়।
ও চাঁদ বদন নয়নে নেহারি যেন প্রাণ বাহিরায়॥

হইবে—ইহা আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়॥"

আজ প্রভু সেই প্রতিজ্ঞা পূরণের এক অবসর পাইয়া হরিদাসের

নরকের কীট গোলোকে তুলেছ, ধু'য়ে নিজ করুণায়,
(আজ) শেষ কৃপা এই ক'রো প্রভু যেন
তোমা আগে প্রাণ যায়।
ভিখারী হইয়া যে মহা মাণিকে ধনী মানি আপনায়,
সে সুখসম্পদে এজীবনে আর, বঞ্চিও না অভাগায়।
(আর মোরে কাঙ্গাল করোনা) (না চাইতে যদি দিয়েছ এত)
যে প্রেমের হাট মিলায়েছ তুমি আপনি ভাঙ্গিবে তায়,
এই ক'রো প্রভু ভরা হাটে যেন দুঃখিয়া পরাণ যায়।
গোবিন্দদাস কহে হরিদাস অধমে লইও নায়,
বলি গৌর হরি, গৌরাঙ্গ কাণ্ডারী করি, যেন পার পায়।
(তোমায় ধ'রে যেতে পারি) (গৌর নাম ল'য়ে ল'য়ে)
(গৌর গুণ গেয়ে গেয়ে)

যথারাগ—ঝপ্‌তাল

প্রভু কহে হরিদাস য তুমি মাগিবে।
কৃষ্ণ কৃপাময় তাহা অবশ্য করিবে॥
(তিনি ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্প-তরু) (দয়াময় কৃষ্ণ আমার)
কিন্তু আমার যে কিছু সুখ সব তোমা লঞা।
তোমার যোগ্য নহে যেতে আমারে ছাড়িয়া॥
চরণে ধরি কহে হরিদাস না করিহ মায়া।
অবশ্য মো অধমে প্রভু কর এই দয়া॥

কুটীরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, কেননা হরিদাস জীবন ব্যাপিয়া প্রভুর উপর্য্যুক্ত আদেশ কায়মনোবাক্যে পালন করিয়াছিলেন।

মোর শিরোমণি কত কত মহাশয়।
তোমার লীলার সহায় কোটী ভক্ত হয়॥
আমা হেন এক কীট যদি মরি গেল।
এই পিপীলিকা মৈলে পৃথিবীর কা ক্ষতি হৈল॥
মধ্যাহ্ন করিতে প্রভু চলিলেন আপনে।
ঈশ্বর দেখি আসি কালি দিবা দরশনে॥

রাগিণী বেহাগ—তাল তেওট (পরে দাশপাড়িয়া।)

তবে মহাপ্রভু তারে করি আলিঙ্গন।
মধ্যাহ্ন করিতে সমুদ্রে করিলা গমন॥
প্রাতঃকালে ঈশ্বর দেখি সব ভক্ত লৈয়া।
হরিদাস দেখিতে আইল শীঘ্র করিয়া॥
প্রভু কহে হরিদাস কহ সমাচার।
হরিদাস কহে প্রভু যে কৃপা তোমার॥
অঙ্গনে আরম্ভিলা প্রভু মহাসংকীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর পণ্ডিত তাহা করেন নর্ত্তন॥
স্বরূপ গোঁসাই আদি যত প্রভুর গণ।
হরিদাসে বেড়ি করে নাম সংকীর্ত্তন॥
রামানন্দ সার্ব্বভৌম সবার অগ্রেতে।
হরিদাসের গুণ প্রভু লাগিলা কহিতে॥
হরিদাসের গুণ কহিতে হইলা পঞ্চমুখ।
কহিতে কহিতে প্রভুর বাড়ে মহাসুখ॥*

---

* প্রভু আজ শ্রীমুখে হরিদাসের মহিমাকীর্ত্তন করিতে লাগিলেন,—প্রভু বলিলেন—ভক্তগণ! তোমরা জান কি এ কোন হরিদাস? এ হরির

ধানশী—দাঁশ পাড়িয়া

হরিদাস নিজাগ্রেতে প্রভুরে বসাইল॥
নিজ নেত্র দুই ভৃঙ্গ মুখপদ্মে দিল॥

সেই নিত্যদাস যিনি জীবনে মরণে কখনও হরিকে বিস্মৃত হন না; এ সেই হরিদাস—যে আপন মহিমায় নামের প্রভাবে বাজারের বেশ্যাকে "পরম মহান্তী" পদে উন্নীতা করিয়াছেন; এ সেই হরিদাস যিনি ৩ লক্ষ জপ পূর্ণ না করিয়া জল গ্রহণ করেন না; এ সেই হরিদাস যিনি জন্মতঃ যবন হইলেও তপস্যার বলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ পদবীলাভ করিয়াছেন এবং যাঁহাকে স্বয়ং অদ্বৈত গোসাঞি দ্বিজশ্রেষ্ঠ বলিয়া শান্তিপুরে শ্রাদ্ধবাসরে শ্রাদ্ধপাত্র দান করিয়াছিলেন, এ সেই হরিদাস যাঁহার প্রভাবে স্বয়ং মায়াদেবী সন্ত্রস্তা হইয়া ইহাঁকে আপন পাশ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন, এ সেই হরিদাস যিনি শান্তিপুরের বাইশ বাজারে ক্রমাগত বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াও কৃষ্ণনাম ত্যাগ করেন নাই বরং তদবস্থায় ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে কাজীর নিকট আনীত হইলে,কাজী যখন শ্লেষপূর্ণ তীব্রস্বরে বলিয়াছিল—এখনও কাফেরের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কলমা পড়িয়া পবিত্র ইস্লাম ধর্ম্মে ফিরিয়া আয়,নতুবা বেত্রাঘাতে তোর প্রাণ যাবে,"—তখন সহস্র প্রহারে জর্জ্জরিত, ক্রমাগত রক্তমোক্ষণে দুর্ব্বল ও মৃতপ্রায় হরিদাস সিংহের মত গর্জ্জন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"খণ্ড খণ্ড হয় দেহ যায় যদি প্রাণ।
তথাপি বদনে নাহি ছাড়ি কৃষ্ণনাম॥"

এ সেই হরিদাস যিনি উক্তরূপে বাইশ বাজারে বেত্রাঘাত সহ্য করিয়াও মনে মনে সেই আততায়ীদিগের জন্য শ্রীশ্রীপ্রভুর পদে প্রার্থনা করিতেছিলেন।

"এ সব পাপীর প্রভু ক্ষম অপরাধ।
এ সব পাপীরে তুমি করহ প্রসাদ॥"

স্বহৃদয়ে আনি ধরি প্রভুর চরণ।
সর্ব্ব-ভক্ত-পদরেণু মস্তক ভূষণ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু বলে বার বার।
প্রভু মুখ মাধুরী পিয়ে নেত্রে জলধার॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শব্দ করি উচ্চারণ।
নামের সহিত প্রাণ কৈল উৎক্রামণ॥
মহাযোগেশ্বর প্রায় স্বচ্ছন্দে মরণ।
ভীষ্মের নির্য্যাণ সবার হইল স্মরণ॥
হরে কৃষ্ণ শব্দে সভে করে কোলাহল।
প্রেমানন্দে মহাপ্রভু হইলা বিহ্বল॥
হরিদাস-তনু কোলে লৈলা উঠাইঞা।
অঙ্গনে নাচেন প্রভু প্রেমাবিষ্ট হঞা॥
প্রভুর আবেশ দেখি সব ভক্তগণে।
প্রেমাবেশে সবে নাচে করেন কীর্ত্তনে॥
এই মত নৃত্য প্রভু কৈল কতক্ষণ।
স্বরূপ গোঁসাঞি প্রভুকে কৈলা সাবধান॥
হরিদাস ঠাকুরে তবে বিমানে উঠাইঞা।
সমুদ্রতীরে লঞা গেলা কীর্ত্তন করিঞা॥
আগে মহাপ্রভু চলে নৃত্য করিতে করিতে।
পাছে নৃত্য করে বক্রেশ্বর ভক্তগণ সাথে॥
হরিদাসে সমুদ্রজলে স্নান করাইলা।
প্রভু কহে সমুদ্র এই মহাতীর্থ হৈলা॥

হরিদাসের পাদোদক পিয়ে ভক্তগণ।
হরিদাসের অঙ্গে দিল প্রসাদী চন্দন॥
ডোর কড়ার প্রসাদ বস্ত্র অঙ্গে দিল।
বালুকার গর্ত্ত করি তাহাতে শোয়াইল॥
চারিদিকে ভক্তগণ করেন কীর্ত্তন।
বক্রেশ্বর আদি করেন আনন্দে নর্ত্তন॥
হরি বোল হরি বোল বলে গৌর রায়।
আপনে স্বহস্তে বালু দিল তার গায়॥
বালু দিয়া তার উপরে পিণ্ডি বাঁধাইল।
চৌদিকে পিণ্ডির মহা আবরণ কৈল॥
তবে মহাপ্রভু করেন নর্ত্তন কীর্ত্তন।
হরিধ্বনি কোলাহলে ভরিল ভুবন॥
তবে মহাপ্রভু সব ভক্তগণ সঙ্গে।
সমুদ্রে করিলা স্নান জলকেলিরঙ্গে॥
হরিদাস প্রদক্ষিণ করি আইলা সিংহদ্বারে।
হরিকীর্ত্তন কোলাহল সকল নগরে॥
সিংহদ্বারে আসি প্রভু পসারির ঠাঞি।
আচল পাতিয়া প্রসাদ মাগিল তথাই॥
হরিদাস ঠাকুরের মহোৎসবের তরে।
প্রসাদ মাগিলা ভিক্ষা দেহ ত আমারে॥
শুনিয়া পসারি সব চাঙ্গড়া উঠাইঞা।
প্রভুকে প্রসাদ দেয় আনন্দিত হঞা॥

স্বরূপ গোসাঞি পসারিরে নিষেধিল।
চাঙ্গড়া লঞা পসারি পসারে বসিল॥
স্বরূপ গোসাঞি প্রভুকে ঘরে পাঠাইল।
চারি বৈষ্ণব চারি পিছোড়া সঙ্গে রাখিল॥
স্বরূপ সোগাঞি কহে সব পসারিরে।
এক এক দ্রব্যের একেক পুঞ্জা আনি দেহ মোরে॥
এই মত নানা প্রসাদ বোঝা বান্ধিয়া।
লঞা আইলা চারিজনের মস্তকে চড়াঞা॥
বাণীনাথ পট্টনায়ক প্রসাদ আনিলা।
কাশীমিশ্র অনেক প্রসাদ পাঠাইলা॥
সব বৈষ্ণবে প্রভু বসাইলা সারি সারি।
আপনে পরিবেশে প্রভু লঞা জনা চারি॥
প্রভু না খাইলে কেহ না করে ভোজন।
প্রভুকে সেদিন কাশীমিশ্রের নিমন্ত্রণ॥
আপনে কাশীমিশ্র আইলা প্রসাদ লইঞা।
প্রভুকে ভিক্ষা করাইলা আগ্রহ করিঞা॥
পুরী ভারতী সঙ্গে প্রভু ভিক্ষা কৈলা।
সকল বৈষ্ণব তবে ভোজন করিলা॥
ভোজন করিয়া সবে কৈল আচমন।
সবারে পরাইল প্রভু মাল্য চন্দন॥
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া প্রভু করে বরদান।
শুনি ভক্তগণের জুড়ায় মন প্রাণ॥

হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে তাহা নৃত্য কৈল যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তাঁর মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে সবাকার হইবে কৃষ্ণ প্রাপ্তি।
হরিদাস দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥
কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ।
স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা কৈল সব ভঙ্গ॥
হরিদাসের ইচ্ছা যবে হইল চলিতে।
আমার শকতি তারে নারিল রাখিতে॥
হরিদাস ছিল পৃথিবীর শিরোমণি।
তাহা বিনা রত্নশূন্যা হইল মেদিনী॥
জয় জয় হরিদাস বলি কর ধ্বনি।
এত বলি মহাপ্রভু নাচেন আপনি॥
সবে গায় জয় জয় জয় হরিদাস!
নামের মহিমা যেই করিলা প্রকাশ॥

ইতি শ্রীশ্রীগৌরপদরত্নমালায়
শ্রীশ্রীহরিদাসের নির্য্যাণ পালা সমাপ্ত।